বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

আজহারউদ্দীন খান্

বাংলা একাডেমী : ঢাকা
বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৭৫, নবেম্বর ১৯৬৮

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

উৎসর্গ

স্নেহ-প্রেম-ভালবাসায়, শ্রদ্ধা-প্রীতি-শুভেচ্ছায় যাঁরা আমার মন
ভরে দিয়েছেন তাঁদের কাছেই ফিরব এখন

সূচীপত্র



ভূমিকা

আমাদের মধ্যে উপস্থিত কালে সত্তরের উপরের বয়সের যে বৃদ্ধেরা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং মানসিক সংস্কৃতির প্রসার সাধন করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নাম প্রাবীণ্যে এবং পাণ্ডিত্যে, প্রজ্ঞায় এবং প্রকাশে অগ্রগণ্য। আজ এই ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সন ১৩৭৫ সালের ভাদ্রমাসে—ইঁহাদের নাম এক আঙ্গুলে গণিয়া শেষ করিতে হয়। যেমন, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—৮৭ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার আলোচ্য বিদ্যা শিল্পকলায় এখন-ও গবেষণা এবং পুস্তক প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন; যেমন, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক —৮৪ বৎসর বয়সের এই তরুণ গবেষক এখনও কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার বিকাশ দেখাইতেছেন; যেমন, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়—যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের অগ্রগণ্য—৮০ বৎসর বয়সে-ও এখনও লেখনী ত্যাগ করেন নাই; যেমন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন—বৈষ্ণব সাহিত্যের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের প্রধান ধারক, বাহক ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার গভীর সাধনা হইতে এই ৭৯ বৎসর বয়সে-ও নিরস্ত হন নাই। তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রহিয়াছেন ৭৬ বৎসর বয়সের ভৌতিকী বিদ্যার গবেষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এবং ৮২ বৎসর বয়সের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু। ভৌতিকী বিদ্যার আবেদন অতি অল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞের নিকট-ই পুর্ণরূপে পঁহুছায়। কিন্তু ভাষা বা বাকৃতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে, যাহা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইগুলির আলোচনা এবং পরিবর্ধন যাঁহারা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত পথে করিয়া যান, তাঁহারা এক হিসাবে সমগ্র জাতির—জনসাধারণের—চিত্তকে উর্বর ও রসসিক্ত করিয়া দেন, এবং দেশের মানুষের মনে সোনা ফলাইয়া দিতে সহায়তা করেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আধুনিক কালের জ্ঞানিমণ্ডলের মধ্যে এই শ্রেণীরই মানুষ। তিনি চিরজীবন জ্ঞানের সাধনাই করিয়া আসিয়াছেন—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, প্রবচন, উপদেশ, গ্রন্থরচনা, অনুবাদ ও গ্রন্থসম্পাদনা—এই-সব কাজেই এই জ্ঞানতপস্বীর সুদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত হইয়াছে। ইঁহার জীবনে চটকদার বা চমকপ্রদ কিছু ঘটে নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিরাও পটহনিনাদে

জনসাধারণের কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়া দেন—এরূপ করিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। অথচ রাজনৈতিক "নেতা"দের ক্ষণস্থায়ী দাপটের কোনও মূল্য ইতিহাস দিবে না, যতটুকু দিবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতো পণ্ডিতের, মানুষের মন গড়িয়া তুলিবার সার্থক কৃতিত্বকে।

বাঙ্গালা ভাষার সুলেখক মৌলবী আজহারউদ্দীন খান, এই বিদ্বত্তার পুণ্য অবদানের অনুপ্রেরণাময় ইতিহাস জাতিধর্মনির্বিশেষে সমগ্র বঙ্গভাষীর নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া, তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র, এবং আশা করি যে, তাঁহার এই ঋষিঋণ-শোধের প্রয়াস, দেশে বঙ্গভাষী জনগণ সাদরে গ্রহণ করিবেন। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সহিত আমার আলাপ কতদিনের তাহা হিসাব করিতে বসিব না। তিনি কলিকাতায় কলেজে আমা-অপেক্ষা দুই বৎসরের প্রবীণ ছিলেন। যতদূর মনে হইতেছে, সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিবার পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষার জন্য যথারীতি দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে আগ্রহী হইয়াছিলেন। সংস্কৃতের এম-এ-র পাঠ্যের মধ্যে তখন বেদও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসে তখন বেদ পড়াইতেন বাঙ্গালার বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের ছাত্র হইবেন এবং তাঁহার কাছে বেদ পড়িবেন, এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিলেন যে বিধর্মীকে তিনি বেদ পড়াইবেন না। স্যার আশুতোষের সানুনয় নিবেদনে-ও তিনি বিচলিত হইলেন না; বলিলেন যে তিনি পদত্যাগ করিবেন। এই ব্যাপার লইয়া সেই সময়ে কলিকাতায় একটু বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া তখনকার দিনের বিখ্যাত মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি সাহেব, যিনি সেই সময়ে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য তাঁহার সুপরিচিত ইংরেজি পত্রিকা Comrade 'কমরেড' প্রকাশ করিতেন, তিনি The Shahidullah Affair এই শীর্ষকে কতকগুলি জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শহীদুল্লাহ্ সাহেব এইভাবে লোকের চোখের সামনে আসিয়া পড়েন। স্যর আশুতোষ এই ব্যাপারে বিব্রত হইয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে তিনি এই-সব ঝঞ্ঝাট থাকার দরুন এম-এ সংস্কৃতে না পড়িয়া 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' বিষয় যেন গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত ও বৈদিক ভাষাতত্ত্বেরও একটা স্থান আছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ স্যর্ আশুতোষের পরামর্শ বিশেষ সদ্ভাবের সহিত মানিয়া লন, এবং Comparative Philology-তেই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন এবং তাহাতে কৃত-

কার্য্য-ও হন। এই সময়ে তাঁহাকে ইউরোপ হইতে Comparative Philology-র কিছু বই আনাইতে হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ১৯১১ কি ১৯১২ সালে। যতদূর মনে হইতেছে, কলিকাতার কলেজ স্ট্রীটে S. K. Lahiri & Co-র দোকানের মারফৎ তিনি বিলাত হইতে এই-সকল বই আনান। এবং একদিন বিকালে S. K. Lahiri-র দোকানে তাঁহাকে আমি দেখি—তিনি এই বইগুলি লইতে আসিয়াছিলেন। Comparative Philology-র সম্বন্ধে আমারও মনে প্রবল আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল—সহজেই সমানধর্মা বলিয়া ডক্টর শহীদুল্লাহের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিলাম না। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া একটি বিশেষ শিক্ষিত ও মার্জিত মনের পরিচয় পাইলাম, এবং তিনিও আমাকে অনুজের মতন দেখিতে লাগিলেন। তারপর তিনি যথাকালে এম-এ পাস করিয়া গেলেন, বোধ হয় সঙ্গে-সঙ্গে আইন পরীক্ষাতেও পাস করেন, এবং এম-এ বি-এল্ হইয়া কোথায় যেন ওকালতি আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় পরে কলিকাতায় আসিবারও অভিলাষ ছিল। কিন্তু তাঁহার মন ছিল বিদ্যাচর্চার দিকে, পঠন-পাঠন এবং গবেষণার দিকে। ওকালতিতে তিনি পসার জমাইতে বা মন বসাইতে পারিলেন না। স্যর আশুতোষ তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ্-ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নিজের হিতৈষী গুরুর মত দেখিতেন। স্যর আশুতোষ-ই তাঁহাকে বিদ্যার সাধনায় আত্মনিয়োজিত হইতে উপদেশ দেন।

এইভাবে শহীদুল্লাহ্ সাহেব লক্ষ্মীর রত্নভাণ্ডার ত্যাগ করিয়া সরস্বতীর পুষ্পোদ্যানে স্থান লাভ করিলেন, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর মানসিক উৎকর্ষের পক্ষে বিশেষ লাভ এবং উপকার হইল। শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে Humanities বা মানবিকী বিদ্যায়, অর্থাৎ ভাষা সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি ধর্ম দর্শন আধ্যাত্মিকতার সাধন এবং রস অর্থাৎ শাশ্বত সত্তার মধ্যে নিহিত যে আনন্দের অনুভূতি—এই-সব বিষয়ে তিনি একজন সর্বজ্ঞর আচার্য্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি, অধ্যাপক শহীদুল্লাহের কর্মজীবনে চমকপ্রদ বা চটকদার কিছু পাওয়া যাইবে না। তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, এবং ইসলামের সূফী সাধকগণের নির্দিষ্ট সাধনমার্গে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি-ও তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কাম্য হইয়া আছে। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত আলাপে আমার এই ধারণা দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার শিক্ষা ও কর্মজীবনের কথা আমি বলিব না, এবং সমস্ত খুঁটিনাটিও আমার জানা নাই। তবে আমি বরাবরই ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্থাৎ

যুক্তিতর্কানুমোদিত বিচারশৈলী দেখিয়া, নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমাদের উভয়ের সাধারণ আলোচ্য বিদ্যা বাকৃতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে নূতন অনেক জিনিস দিয়াছেন, তাহার কতকগুলি আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি, এবং কতকগুলি সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্র মত পোষণ করি। কিন্তু এবিষয়ে এই মতান্তর গৌণ ব্যাপার। তিনি যাহাই লেখেন তাহা অধিকারী পণ্ডিতদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত পাঠের যোগ্য। কোন-ও কোন-ও বিষয়ে তিনি একটু বিশেষভাবে সাবধান-তার পক্ষপাতী, এবং আমাদের দেশে এইরূপ সাবধানতার একান্ত অভাব বলিয়া ইহার আবশ্যকতাও আছে। মহাকবি চণ্ডীদাসের রচনা স্থিরীকৃত করিবার জন্য বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ও আমি, আমরা উভয়ে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহু শত পদ অনুশীলন করিয়া, অন্ততঃ পক্ষে তিন জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলাম। পুরা বস্তুকে এইভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য অনেকে ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং আমাদের বিরূপ সমালোচনাও করিয়া-ছিলেন। কিন্তু মনে হয়, একাধিক চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন, এই ধারণা এখন ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত আমাদের দুইজনের সম্পাদিত "চণ্ডীদাস-পদাবলী" গ্রন্থে বহুবর্ষ পূর্বে আমরা এই সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছিলাম যে, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সহস্রাধিক পদের মধ্যে মাত্র চব্বিশটি কি পঁচিশটি আদি বা প্রথম চণ্ডীদাস—বাসলী-দেবীর পূজক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। এই 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস' ছিলেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থের রচয়িতা। শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাদের এই মত সমালোচনা করিয়া তাঁহার রায় দেন—চব্বিশটি বা পঁচিশটি নয়, মাত্র গুটি ছয়-সাত প্রথম বা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে। আজকালকার সাহিত্যিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় এইরূপ সাবধানতা সুদুর্লভ।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রধান কৃতিত্ব—বাঙ্গালীর ভাষার ও সংস্কৃতির সার্থক আলোচনা, এবং আনুষঙ্গিকভাবে মুসলমান বাঙ্গালীর আহৃত উপাদান নির্ণয় করা। শহীদুল্লাহ্ সাহেব সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অন্যান্য বহু ভারতীয় ভাষা তো জানেন-ই, উপরন্তু ইংরেজীর অতিরিক্ত ফরাসী ভাষাতেও তিনি বই লিখিয়াছেন। তিব্বতী ও অন্যান্য বহু বিদেশী ভাষার সহিত তাঁহার কার্য্যকর পরিচয় আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি ফারসী ও আরবীর একজন উস্তাদ ও আলেম, এবং শুনিয়াছি তাঁহার আরবীর জ্ঞানের প্রশংসা বড়-বড় আলেমরাও করিয়াছেন। তিনি উর্দু হইতেও কবিতার বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং গবেষণা-

ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক যে বহু ভাষার জ্ঞান, তাহা তাঁহার মানসিক যোগ্যতার মধ্যে অন্যতম প্রধান গুণ ও শক্তি।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব একজন আস্থাশীল এবং নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতব্যক্তি—নিজের ধর্মে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া বিশেষ সহানুভূতির সহিত তিনি অন্য ধর্মের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বজাতির জনগণের মধ্যে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান ধর্মের অতিরিক্ত যে-সমস্ত লোকধর্ম প্রচলিত আছে, সেগুলির সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টি সহানুভূতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। শুনিয়াছি, তিনি সূফী পীর বা ধর্মগুরুর বংশের মানুষ। তাঁহার মনে উচ্চ স্তরের সূফিয়ানা বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিজাত ধর্মানুভূতির হাওয়া বহিতেছে।

বহু বহু বার শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায়, ও পরে দেশ-বিভাগের ফলে নূতন করিয়া বঙ্গভঙ্গ হইলে ঢাকায়, গভীর ও অন্তরঙ্গ ভাবে নানা প্রসঙ্গে—ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতি ইতিহাস 'তসওউফ্' বা সূফী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আলোচনা মানসিক রসায়নের কাজ করিয়াছে এবং ইহা আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য।

ডক্টর শহীদুল্লাহের রচিত পুস্তকের তালিকা শ্রীযুক্ত আজহারউদ্দীন সাহেব দিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রের পরিধির একটা অনুমান করিতে পারা যাইবে। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী—তাঁহাকে আমরা একজন যুগনায়ক "মুসলমান **বাঙ্গালী**" বলিয়া অভিবাদন করি। তিনি তাঁহার বাঙ্গালীত্বের মর্যাদা ভুলিয়া যান নাই। তিনি পুরাপুরি "মুসলমান বাঙ্গালী"—কেবল "বাঙ্গালী মুসলমান" নহেন—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মুসলমানত্বের খাতিরে তাঁহার সাধনায় বাঙ্গালীত্বকে বিসর্জন দেন নাই। মুসলমান আদর্শ ও সাধনা এবং বাঙ্গালীর জীবন, এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে দেখা যায়।

কিন্তু সেইটাই শেষ বা বড় কথা নহে। তিনি একজন সংস্কার-পূত চিত্তের মানুষ, এবং এইরূপ মানুষ-ই Full Man—"পূর্ণ মানব" অথবা "ইন্সান্-অল্-কামিল্"—পদবীতে পহুঁছিবার পথে জয়-যাত্রা করিবার যোগ্য।

অগ্রজকল্প শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের স্বস্থ এবং সুস্থ শতায়ু কামনা করিয়া তাঁহার প্রতি আমার এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা নিবেদন সমাপ্ত করিতেছি॥

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১০ আশ্বিন বাঙ্গালা সন ১৩৭৫ সাল
২৭ সেপ্টেম্বর খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৮

নিবেদন

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্যের ওপর পরিচয়যোগ্য কোন গ্রন্থ কিংবা তাঁর নামে নিবেদিত কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা আমাদের এধারের বাঙলায় প্রকাশিত হয়নি। অথচ প্রচারের যুগে ঢক্কা-নিনাদের অন্তরালে তাঁর মত নীরব নিরলস নিরহঙ্কার সাহিত্যসাধকের প্রতি উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ। উনিশ শতকে যে মহৎ চরিত্রের শোভাযাত্রার সমারোহ চলেছিল সেই মিছিলের নির্জন কনিষ্ঠ মানুষটি কালের ছন্দ অতিক্রম ক'রে আজ বঙ্গসংস্কৃতির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর জীবন ও সাহিত্যে অনেক আলোর কণিকা ছড়িয়ে আছে। সেই ফুল্‌কি থেকে নিজের চিন্তার দীপ জ্বালিয়ে মননকে আলোকিত করলে জাতি হিসেবে আমরাও দীর্ঘজীবী হব।

ডক্টর সাহেব সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য আমি অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন সময়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিছক কৌতূহলে সংগ্রহ করেছিলাম। ভাবিনি তাঁকে নিয়েই একটি বই লিখতে হবে আর তাঁকে নিয়ে বই লেখা কঠিন কাজ, কেননা তাঁকে আমরা এধারে কতটুকু পেয়েছি—অবিভক্ত বাঙলায় যা পেয়েছিলাম বিভক্ত বাঙলায় তা বিলুপ্তপ্রায়, তার ওপর আদান-প্রদান সব বন্ধ। দম আটকানো পরিবেশে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তারই কিছু অংশ নিয়ে ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে সাধ্যের সীমা বিচার না করেই তাঁর সম্পর্কে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করি। ঐ প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এ (এপ্রিল ৭, ১৯৬৭ : চৈত্র ২৪, ১৩৭৩) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেকেই তাঁর সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। তাঁদেরই তাগিদে 'তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্' হ'লেও প্রধানতঃ 'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ'। তাঁর বিশেষ বন্ধু ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থ-রচনার সময় ভূমিকা লেখার আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর আন্তরিক স্নেহপুর্ণ উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে আরও বেশী ক'রে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভূমিকাটি এ গ্রন্থের একদিকে যেমন প্রধান শিরোভূষণ অপরদিকে তেমনি ডক্টর সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও মননের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনের অমূল্য সম্পদ। তাঁকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।

মফঃস্বলে থাকার দরুণ তথ্য অনুসন্ধান ও বইপত্র সংগ্রহ করতে প্রচুর অসুবিধা

হয়েছে তাই কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল। তবু আমার সীমিত শক্তির দ্বারা সংগৃহীত মূলধনে সীমাহীন সাধ যুক্ত ক'রে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের একটি সামগ্রিক রেখাচিত্র দিতে চেষ্টা করেছি। সূর্যকে প্রদীপ জ্বেলে চেনানো যায় না, আরাধনা করা যায়। এ বই সেই অর্চনারই আরতি। সৌভাগ্য বশতঃ তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন কিন্তু পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর স্মৃতি অবলুপ্ত। যিনি সারাজীবন লেখাপড়ার চর্চায় মগ্ন থেকেছেন অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি নাম স্বাক্ষর করতে অপারক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আজীবন মাসিক পাঁচ শ টাকার সম্মান-দক্ষিণায় 'ইমেরিটাস' অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই অধ্যাপনার কোন কাজ করার নির্দেশ এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দেবার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, শুধু আলাপ-আলোচনা ক'রে তাঁর সাহচর্যে এসে ছাত্র-শিক্ষক যাতে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন সেজন্যেই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে। নাম সই করতে পারেন না বলে বিশ্ববিদ্যালয় টিপসই দিয়ে টাকা নেবার প্রস্তাব তাঁকে দেন কিন্তু যিনি নিরক্ষতার বিরুদ্ধে সারাজীবন অভিযান চালিয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই সম্পর্কে 'দৈনিক পাকিস্তান' (১৯শে মে, ১৯৬৮ : ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫) যে সংবাদ-চিত্র পরিবেশন করেছিলেন তারই কিয়দংশ উদ্ধৃত কচ্ছি—এর মধ্যে তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা, চারিত্রিক মাধুর্য, দৃঢ়তা ও কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

: প্রায় চার কুড়ি বছর একটানা জ্ঞানচর্চার পর আজ জীবনসায়াহ্নে পৌছে অসুস্থ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে কালি মেখে টিপসই দিতে হচ্ছে !···

নিদারুণ বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে বোবার মত চেয়ে রইলেন পুত্র জনাব সফিয়্যুল্লাহ্‌র দিকে অশীতিপর ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।· ·

···অসুস্থ অবস্থায় তাঁর অজান্তে কয়েকমাস টিপসই দিয়ে এই টাকার চেক গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু সেদিন বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গেলেন তিনি—টিপসই ক'রে চেক নিতে হবে তাঁকে ?···

সাময়িক বিমূঢ়ভাব কেটে গেলে পুত্র সফিয়্যুল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন—'টিপসই দিয়ে চেক আমি নেব না। ওদের মানা ক'রে দাও।'···

তাঁকে দিয়ে টিপসই আর করানো যায় নি। সফিয়্যুল্লাহ্ সাহেব বললেন,

'পাওয়ার অব অ্যাটর্নির বলে আমিই স্বাক্ষর ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চেক নিয়ে এসেছি।'

কয়েকদিন থেকে তিনি আবার সামান্য অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। তাই চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে তাঁর নিত্যকার রাউণ্ডে একদিন বের হ'তে পারেননি।

কিছুদিন আগে অসুস্থ হ'য়ে মুসলিম বাংলার অন্যতম দিক্‌পাল মওলানা আকরম খাঁ হাসপাতালে এসেছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ চাকালাগানো চেয়ারে বসে প্রত্যেকদিন তাঁর কাছে গিয়ে বিস্তারিত খবর নিতেন।

পরিচিত নতুন কেউ হাসপাতালে এল কিনা, সে খবরটা তাঁকে প্রত্যেক দিন নিতে হবে। অতি সামান্য পরিচয় ছিল হয়ত কারো সাথে, তার খবরটাও দৈনিক নিতে হবে— যেন কত দিনের গভীর আত্মীয়তা!

এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে তিনি যেমন কর্মতৎপর ছিলেন— এই বৃদ্ধ বয়সে সে তৎপরতা নিতান্ত বিরল— কিন্তু অসুস্থ হ'য়ে পড়েও চাকা-লাগানো চেয়ার ঠেলে ঠেলে রোগীদের খবর নিয়ে সেই তৎপরতা ঠিক রেখেছিলেন। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সায়াহ্নে এসেও তিনি যেন কর্তব্যের কথা ভুলতে পারছেন না।

রোগাক্রান্ত হবার মাস দুয়েক আগে কোন এক ছাত্রের কাছে নিজের জন্মভূমি দেখার কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রে লিখেছিলেন, "দেশান্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না, সেইরূপ জন্মভূমিও বদলায় না। আমি একবার জন্মভূমিতে গিয়া তোমাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু নানা কারণে তাহা ভাগ্যে ঘটিবে কিনা জানি না।" দুঃখের বিষয় আশা ফলবতী হবার আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যখন তিনি সুস্থ ও কর্মঠ ছিলেন তখন তাঁকে দেখিয়ে এ পরিচয়টি যাতে প্রামাণিক হয় সে-চেষ্টা আমি করেছি। তাঁর একাশী বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংবর্ধনা-গ্রন্থটি আমাকে স্নেহোপহারস্বরূপ তিনি পাঠিয়েছিলেন এবং পত্রাঘাতের দ্বারা আমার অনেক উৎপাত তিনি সহ্য করেছেন। তাঁর সংবর্ধনা-গ্রন্থ থেকে আমি প্রচুর সহায়তা পেয়েছি। তিনি তাঁর রচনাবলীর তালিকাও পাঠিয়েছিলেন যেটি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থপরিচয়-সংকলনের কাজে সহায়তা করেছে। এই গ্রন্থের মুদ্রিত ফর্মা তাঁকে পর পর পাঠিয়েছি— হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও তিনি দেখে খুশী হয়েছেন এবং আমার উদ্যমের জন্য সাধুবাদ দিয়েছেন। চিঠি লিখতে পারেন না ব'লে পুত্র জনাব

সফিয়্যুল্লাহ্‌কে চিঠি মারফৎ তাঁর খুশী হবার কথা আমাকে জানাতে বলেছেন। আমার প্রতি তাঁর এই স্নেহ আমায় অভিভূত করেছে। আজ এই কালজয়ী মনীষীর সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা করি।

যে কোন প্রকারের ঋণই হ'ক না কেন, কারো ঋণ কখনই শোধ করা যায় না, এমন কিছু আছে সংসারে যাকে স্থূল মূল্য দিয়ে বাঁধা যায় না। আর কেউ হয়ত পারতে পারেন, আমি অন্ততঃ পারিনে— সব ঋণ, সবার ঋণই আমার কাছে অপরিশোধ্য মনে হয়। তাই ঋণ শোধের স্পর্ধা না ক'রে কৃতজ্ঞচিত্তে এবার সকলের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করে যাই। জনাব মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্‌ সাহেবের সহায়তা না পেলে গ্রন্থ-রচনায় অগ্রসর হতাম কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁর পিতৃদেবের কিছু কিছু গ্রন্থ আমার প্রয়োজনের সময় পাঠিয়েছেন, তথ্যসংগ্রহের বাধাকে অপসারিত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য যথাযথ স্থানে আমি সবটা ব্যবহার করতে পারিনি কারণ, মুদ্রণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের চিঠিপত্র সময়মত যাতায়াত করেনি। এজন্যে পরে প্রাপ্ত তথ্যগুলি 'সংশোধন ও সংযোজন' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হ'ল। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের বর্তমান অসুখের যাবতীয় সংবাদ 'দৈনিক পাকিস্তান', 'Morning News', 'Pakistan Observer' সংবাদপত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। এর কাটা-অংশগুলি তিনিই পাঠিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত চিত্র এবং শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিও তিনিই পাঠিয়েছেন। প্রচ্ছদপটের চিত্রটি ঢাকার শিল্পী জনাব আবুল কাসেমের অঙ্কিত চিত্রের অনুকরণে এবং গ্রন্থের নামের বর্ণলিপি মূল হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর থেকে এধারের শিল্পী শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এঁকেছেন। অন্য চিত্র-দুটির একটি মূর্তজা বশির কর্তৃক অঙ্কিত। সফিয়্যুল্লাহ্‌ সাহেবের পাঠান অন্য আরো কয়েকখানি চিত্র এ-গ্রন্থে ব্যবহার করা সম্ভব হ'ল না। এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। বলাবাহুল্য, এই বইয়ের সর্বত্র তাঁর প্রীতির স্পর্শ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য-পত্রিকা'র প্রতিটি সংখ্যা আমার দেখার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন যার সাহায্যে আমি ঐ পত্রিকায় শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটি অব.পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক জনাব ডঃ আবদুল করিম সাহেব 'Muhammad Sahidullah Felicitation Volume'টি অনুগ্রহ ক'রে না পাঠালে কোন কালেই সেটি আমার দেখা হ'ত না। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাংলাভাষা উন্নয়ন বোর্ডের (Central Board for Development of Bengali) পরিচালক জনাব ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক

সাহেবের ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় শহীদুল্লাহ্ সাহেব সম্পর্কে লিখিত দুটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ থেকেও পেয়েছি আমি গভীরভাবে আলো। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃথকভাবে ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিস্মরণ অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখে পাঠিয়েছিলেন সেটিও আমাকে সাহায্য করেছে। বই লেখা আরম্ভ হবার আগেই যিনি পরিকল্পনার কথা শোনামাত্রই নিজস্ব ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ না ক'রেই বইটির প্রকাশভার গ্রহণ করেন সেই দুঃসাহসী প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে বের করার জন্য রুগ্ন শরীর নিয়ে তিনি ও শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী যে-রকম পরিশ্রম করেছেন তার তুলনা নেই। শহীদুল্লাহ্ সাহেব সুস্থ থাকলে তাঁদের পরিশ্রম ও আমার আনন্দ পুরোপুরি সার্থক হ'ত। তবু তাঁর হাতে বইটি যে তুলে দিতে পারলাম অসীম বেদনার মধ্যে তাই আজ সৌভাগ্যের দান বলে মনে করি।

ডক্টর সাহেবের সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় নেই, আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। রাজনীতির চাতুরীতে তিনি আজ বিদেশী, সেজন্য পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে Indian Council for Cultural Relationsএর সম্মানীয় ফেলোশিপ গ্রহণ করতে পারেননি (১৯৬২, ২১শে এপ্রিল); ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় নেই আমার, শুধু চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেটুকু করা সম্ভব সেটুকুতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। আমার সন্তুষ্টিতেই যে আপনারা তুষ্ট থাকবেন সে ভরসা আমি করছি না বরং একটি অভিলাষ মনে মনে পোষণ করছি। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনেক ছাত্র এধারের বাঙলায় রয়েছেন, তাঁরা যদি উদ্যোগী হয়ে বৃহৎ কিছু ক'রে গুরুঋণ স্বীকারে তৎপর হন আর তখন যদি আমার এই গ্রন্থ অকিঞ্চিৎকরও বিবেচিত হয় তাতে আমি লেখকোচিত আনন্দ পাব। তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন সেটাই হবে আমার তৃপ্তির প্রধানতম কারণ। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশী ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙ্গে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

মীরবাজার, মেদিনীপুর
২০ আশ্বিন, ১৩৭৫; অক্টোবর, ১৯৬৮

আজহারউদ্দীন খান্



উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। চারদিকের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন, উত্তেজনার জোয়ারে তাঁর প্রাণপুরুষ স্নাত হয়েছে কিন্তু রাজনীতির ঘূর্ণীপাকে তিনি ভেসে যান নি। সেদিন বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান প্রবাহ ছিল দুটি—রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। একদিকে আইন অমান্য, বিদেশী দ্রব্যবর্জন, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্দীপ্ত করা ও ইংরেজের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগের দ্বারা সম্পর্ক ছিন্নের প্রয়াসকে সংহত করা; অপরদিকে দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য জাতীয় জীবন-গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। শহীদুল্লাহ্‌ রাজনীতির প্রত্যক্ষ দিকের সঙ্গে কোনদিন জড়িত ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইংরেজের আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসতে শুরু করে-ছিলেন; তাঁর বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দিয়ে তাঁকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু শহীদুল্লাহ্‌ মনে-প্রাণে সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন নি, কারণ তাঁর মতে জাতীয় উন্নতির প্রধানতম সহায় সাহিত্য। তিনি মনে করতেন সংস্কৃতির সাজাত্যকরণ সম্পর্কে সচেতন না হলে রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হতে পারে না। শহীদুল্লাহ্‌ তাই জাতীয় জীবন-গঠনের সুমহান দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন; প্রত্যক্ষ আন্দোলন থেকে তার গুরুত্ব সেদিন কম ছিল না। সেজন্যে তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে একদিকে যেমন পাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, অপরদিকে তেমনি পাই হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনার অকৃত্রিম প্রয়াস, যা তাঁকে অবিভক্ত বাঙলায় একজন চিন্তানায়ক বাঙালী মনীষীর মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আজ মনের আড়াল হয়ে গেছেন—বাঙালী জনসাধারণের কাছে

তিনি তেমন পরিচিত নন। এজন্যে দেশের সাধারণ মানুষকে দায়ী করে লাভ নেই। শিক্ষাসত্র, সংস্কৃতিকেন্দ্র—এরাই ত যোগসূত্র রচনা করবেন, কিন্তু এ পোড়া দেশে তার কোন ব্যবস্থা নেই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী ও বৈয়াকরণ হিসেবে শহীদুল্লাহ্ সাহেব এধারের বাঙলায় নামেমাত্র বেঁচে আছেন। স্মরণীয় বাঙালী মনীষী হিসেবে তাঁর নাম আজ কেউ করে না, তাঁর সারাজীবনের সাধনার সঞ্চয় বিস্তীর্ণ অধ্যয়নের স্বাক্ষর-সমন্বিত গ্রন্থাদির সঙ্গে কারুর পরিচয় নেই—হয়ত পরিচয় যেটুকু আছে সেটুকু তরুণ সমাজের পরীক্ষার প্রয়োজনে, সেটুকুও বিস্তৃত নয় কারণ তাঁর কোন গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত নয়; তাঁকে তাঁরা নামেমাত্র জানেন, এধারে রচিত মোটা মোটা সাহিত্য-ইতিহাসের পাদটীকায় তিনি পড়ে আছেন। পূর্ব বাঙলায় তাঁর যে খ্যাতি, এধারের বাঙলায় তার সিকি ভাগও নয়। বেদনার সঙ্গে সত্যি কথা বলতে গেলে দুই বাঙলায় দুটি সংস্কৃতি যেন গড়ে উঠছে। উভয় বাঙলায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমনই এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করছেন যাতে অদূর ভবিষ্যতে দুই বাঙলার মানসিক যোগসূত্র ছিন্ন হবার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় থেকে যাবে। পূর্ব বাঙলায় বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদির ওপর জোর দেওয়া হয়; এধারের বাঙলায় যাঁরা অবহেলিত হয়ে আছেন, সাহিত্যের কিংবা সামাজিক ইতিহাসে নিতান্ত অবজ্ঞায় কিংবা অনাগ্রহে যাঁদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তাঁদের মূল্যায়ন ওধারে হচ্ছে—সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-রচনায় দেশের মুসলমানরা কি করেছেন এবং কি করতে চেয়েছেন তার ইতিহাস-সম্মত বিস্তৃত বিবরণ ওধারের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাচ্ছে। হাজার বছর ধরে মুসলমানরা এদেশে বসবাস করছেন, দেশের আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন, কিন্তু কতিপয় মুসলমান নিজেদের বহিরাগত মনে করতেন বলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই; কেননা এদেশের অ-মুসলমানরাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল। উনিশ শতক নিয়ে অনেক গবেষণা এধারে হয়েছে, কিন্তু কোন গবেষণাই

সম্পূর্ণ হয় নি— খণ্ডিতদৃষ্টির দরুণ হিন্দু-জাতীয়তাবাদই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এধারের বাঙলায় বাঙালী হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনাদির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়— দেশ ও সমাজের ইতিহাস-রচনায় মুসলমান নামক যে এক বৃহৎ সম্প্রদায় ছিলেন তার পরিচয় তেমন নেই, যা দেওয়া হয়েছে তা নিতান্ত অনুগ্রহ করে। দেশবিভাগের আগেও আমরা দেখেছি ঢাকায় যে সাহিত্যান্দোলন হয়েছে এধারের বাঙালীরা তার খরব রাখেন নি। একটা চটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে— যার যৌন পঙ্কিলতা বর্ণনাই প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাকে নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হয়েছে দাপাদাপি হয়েছে এবং সেটি নাকি বাংলা সাহিত্যে একটি যুগের সৃষ্টি করেছে। অথচ ঢাকায় ১৯২৬ সালে যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল এবং তার মধ্যে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে মনুষ্যত্বের সবল চেতনা সাহিত্যে সঞ্চারিত করার মহৎ সঙ্কল্পকে কতিপয় সাহিত্যিক ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম ও ধাম কেউ জানেন বলে মনে হয় না ; বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বার্ষিক মুখপাত্র 'শিখা-'র নাম কেউ শুনেছেন কিনা তাও সন্দেহ। এই ত আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার নমুনা। দেশের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। যাঁরা দেশের মানুষের মন ও চেতনাকে পরিচালনা করবেন সেইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররাই আজ ব্যাধিগ্রস্ত। উভয় বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের বাংলা সিলেবাসের ওপর চোখ রাখলে কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। এস. ওয়াজেদ আলী, নজরুল, জসীমউদ্দীন এধারের বাঙলায় দশম একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আছেন। অনার্সে নজরুল কিছুকাল ছিলেন তারপর সযতনে বাদ পড়েছেন। অনার্স ও এম. এ. তে একজন মুসলমান লেখক পাঠ্য নন। তাহলে কি একথাই মেনে নিতে হবে যে উচ্চতর অধ্যয়নের পাঠ্যতালিকায় একজন মুসলমান লেখকও যোগ্য নন, সবাই তৃতীয় শ্রেণীর ? এরই পাল্টা জবাবে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমান লেখকের গ্রন্থ বেশী করে পড়ানো হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের কল্যাণে যা শিখছি তা খণ্ডিতভাবে

জানছি—সবকে জড়িয়ে অখণ্ড সত্তাটিকে খণ্ডিয়ে দেখার চেষ্টা কোন পক্ষ থেকেই হচ্ছে না। দুই বাঙলাতেই কোনটাই সুস্থ চিন্তার পরিচয় দেয় না—দৃষ্টিভঙ্গী শুধু অদ্ভুত নয় নিতান্ত দুঃখেরও। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই অপরিচয়ের দরুণ দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা মাঝে-মধ্যেই হচ্ছে—বিশ বছর ধরে এই হাঙ্গামা আমরা নির্মূল করতে পারি নি। সাম্প্রদায়িতার বিষ যে আমাদের শিক্ষাজগতের পাঠ্যতালিকায় সযত্নে লালিত হচ্ছে তা জানা সত্ত্বেও কি শিক্ষাবিদ কি দেশনেতা কেউই তার প্রতিবিধান করেন নি। দু'একটা কমিশন বসিয়ে কিংবা পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বন করে দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা দেখান তাঁরা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই ভেদবুদ্ধির মধ্যে পড়েন নি—একদিকে বেদ থেকে কুরআন, অপরদিকে সংস্কৃত থেকে আরবী তাঁর নখদর্পণে। তিনি বলেছেন, "আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিদ্যমান। মনে হয় ইহাদের কোনও মিলনভূমি নাই। কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করিলে উভয়ের মধ্যে অনতিবিলম্বেই মূল ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মই পরধর্মসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়—এই সহিষ্ণুতা অন্য ধর্মমতের শ্রদ্ধা হইতেই প্রসূত, পরন্তু ঔদাসীন্য হইতে নহে।···হিন্দু ও মুসলমান নামে দুই মহান জাতি ভারতবর্ষে বসবাস করিবে ইহা বিধাতার ইচ্ছা। ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়বন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া নিরূপিত মহান উদ্দেশ্যসমূহ পৃথিবীতে সুসিদ্ধ করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর পরস্পর সদ্ভাব বিদ্যমান থাকা অতীব প্রয়োজন।" (হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলনভূমি : উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৪০)। তাঁর এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার দরুণ হিন্দু-মুসলমান-মিলিত বাংলা সাহিত্যকে তিনি জাতীয় সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, সমদৃষ্টি ও সমান গুরুত্বে বাংলা সাহিত্যের সব রচনাকে গ্রহণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাংলা সাহিত্যের কথা' দ্বিতীয় খণ্ডের 'মুখবন্ধে' তিনি বলেছেন, "বাঙালা আমার মাতৃভাষা। মাতৃ-ভাষার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার পাত্র।" এই শ্রদ্ধার উৎস

থেকেই তাঁর সব রচনা উৎসারিত।

দেশবিভাগের প্রথমের দিকে এধারের পত্র-পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু লেখা দেখা যেত। যেমন 'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন ১৩৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত মীননাথ ও কানুপার আলোচনার ক্রমানুসারী হিসেবে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি তিনি 'শনিবারের চিঠি'র বিভিন্ন সংখ্যায় লিখেছিলেন—

ফাল্গুন ১৩৫৪ : প্রাচীন বাংলা লেখকগণ
(তান্ত্রিক বৌদ্ধলেখক লুইপাদ, বিরূপাদ, শবরীপাদ)

চৈত্র ১৩৫৪ : প্রাচীন বাংলা লেখকগণ
(মালাধর বসু এবং যশোরাজ খান)

বৈশাখ ১৩৫৫ : প্রাচীন বাংলা লেখকগণ
(বিপ্রদাস, নারায়ণদেব এবং শ্রীকর নন্দী)

কার্তিক ১৩৫৫ : ধর্মমঙ্গল উপাখ্যানের উৎপত্তিকাল

Indian Linguistics, December 1959
: The Indo-Aryan Parent Speech

মুখপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৬০ : মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম শতবর্ষপুতি স্মারক গ্রন্থ (আগস্ট ১৯৬১) : পুণ্যস্মৃতি

প্রবাসী :

ফাল্গুন ১৩৫৪ : ভরত, কণ্ব ও বিশ্বামিত্র

ভাদ্র ১৩৬৩ : শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার একটি পাঠান্তর

মাঘ ১৩৬৩ : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য কত দিনের ?

বৈশাখ ১৩৬৪ : গীতা ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

ফাল্গুন ১৩৬৫ : গল্পের জন্মান্তর

জাগরণ :

পৌষ-চৈত্র ১৩৬৩

বৈশাখ ১৩৬৪—জ্যেষ্ঠ ১৩৬৫ : কুরআন কুঞ্জিকা

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা :

১৩৫৪, ২য় সংখ্যা : হৈহয়-কুলের শার্যাত শাখা

১৩৫৯, ১ম-২য় সংখ্যা : বিদ্যাপতি পদাবলীর সংস্করণ

১৩৬০, ১ম সংখ্যা : ময়ূর ভট্ট

১৩৬০, ২য় সংখ্যা : চণ্ডীদাস-সমস্যা

১৩৬০, ৩য় সংখ্যা : গোরক্ষ-বিজয়ের রচয়িতা

১৩৬১, ২য় সংখ্যা : জেলা চব্বিশ-পরগণার উপভাষা

১৩৬৩, ২য় সংখ্যা : প্রাকৃত ও বাংলা

১৩৬৭, ২য় সংখ্যা : পেয়ার শাহ (চব্বিশ-পরগণার লোক-ইতিহাস)

তিনি দেশবিভাগের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের শিক্ষাসফরে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন (১৯৫৬, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর)। ১৯৫৮ নভেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো কর্তৃক 'International Seminar on Traditional Cultures in South East Asia'তে পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে আসেন এবং সেমিনারের চেয়ারম্যান নির্বচিত হন। ১৯৬১, ৩০শে মে তিনি কলকাতায় নজরুল-জয়ন্তীতে এবং ১৯৬২ সালের ২১শে এপ্রিল পাকিস্থান দূতাবাস কর্তৃক কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইকবাল দিবসে যোগদান করেন। ক্রমশঃ দুটো দেশের মধ্যে বাধা-নিষেধ এমনভাবে আরোপিত হতে লাগল তাতে আমাদের ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। কলকাতা থেকে বিলেত যত সহজে যাওয়া যায়, ঘরের সামনে ঢাকা যাওয়া তত সহজ হল না। আর আমাদের দেশের শিক্ষা বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান একজন মনীষির সাধনাকে সক্রিয়ভাবে জীইয়ে রাখার কোন কার্যকরী ব্যবস্থাও করলেন না। কিছু লোক হয়ত শহীদুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে জানতে পারেন। সেই কিছু লোকের জানা সকলের জানা হয়ে ওঠে নি কিংবা সেই ব্যক্তিগত জানা-শোনা, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমতাদির আলোচনা এধারের কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে দেশবাসীর গোচরে আনা হয় নি।

দুই

সবাই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নয় যাঁর কাছে গুণীর মর্যা ছিল, যিনি প্রকৃত গুণবানকে আবিষ্কার করে মহাদেশ আবিষ্কারে আনন্দ পেতেন। তাঁর মানুষ চেনার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ— কা দিয়ে কী কাজ করালে ভাল ফল পাওয়া যাবে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছি তীক্ষ্ণ। পাকা জহুরী যেমন আসল ও নকল সোনা চিনতে পা তেমনি তিনি অগুণ্তি মানুষের মধ্যে কাজের উপযুক্ত আসল মানুষ বেছে নিতে পারতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্বাচ তাঁর এক মহতী কীর্তি—যাঁর দ্বারা যে কাজটি হবে তাঁকে সে কাজের ভার দিতেন শত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে, এমনকি শিক্ষাগ যোগ্যতা অর্থাৎ একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কম থাকলেও। তা খারাপ ফল কিছু হয় নি বরং তাঁর আবিষ্কৃতি উত্তরকালে এক এক রত্ন বলেই সম্মানিত হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তাঁর আবিষ্কা তিনি যদি তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে না আনতেন তাহলে তাঁকে হয় চিরকাল কোর্টের বটতলায় কালো গাউন পরে মক্কেল নিয়ে কাটা হত। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর জন্য আশুতোষ তাঁর কাছ থেকে আ আবেদনপত্র নেন নি—সরাসরি নিয়োগপত্র পাঠিয়েছিলেন। আজ কালকার দিনে মেকলে কথিত under-developed heart-এ শিক্ষাজগতে এই ঘটনা নিছক রটনা বলেই মনে হবে, কি আশুতোষের পরিপুষ্ট উদার মহৎ অন্তঃকরণের এটাই স্বাভাবিক সং ছিল।

আশুতোষ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর স্নেহচ্ছায়া থে তিনি বঞ্চিত হন নি। তাঁর প্রতি আশুতোষের স্নেহশীলতার কথা ব শেষ করা যায় না। দু-একটি উদাহরণ দিতে লুব্ধ হচ্ছি। একবা নোয়াখালি জেলায় একটা হাইস্কুলের রিকগনিশনের জন্য ঐ স্কুে কর্তৃপক্ষ শহীদুল্লাহ সাহেবকে অগ্রবর্তী করে আশুতোষের কাছে ধ

দেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব দূর করার জন্য আশুতোষ প্রতিটি স্কুলের রিকগনিশনের জন্য একটা ফি ধার্য করেছিলেন। স্কুলের রিকগনিশনের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও স্কুল ইন্সপেক্টর বিরূপ মন্তব্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। যেহেতু শহীদুল্লাহ সাহেব রিকগ-নিশনের পক্ষে বলছেন সেহেতু আশুতোষ বিনাদ্বিধায় স্কুলের রিকগ-নিশন সঙ্গে সঙ্গে করে দিলেন। আর একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার পদের জন্য আবেদনপত্র আশুতোষের অজ্ঞাতে শহীদুল্লাহ সাহেব পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, জানলে আশুতোষ হয়ত ছাড়বেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আবেদন পাঠালে আশুতোষ আপত্তি জানাবেন। তিনি জানতেন না যে আশুতোষ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। যথাসময়ে আশুতোষের কানে শহীদুল্লাহ সাহেবের কথা উঠল। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকার জন্য অধ্যাপকদের বেতন আশানুরূপ দেওয়া যাচ্ছে না, আর্থিক অবস্থা ভাল হলেই অধ্যাপকদের বেতন সবার আগে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া একজনের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটা লোকচক্ষে খারাপ দেখাবে, সেজন্যে কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে সাংসারিক চাপে আশুতোষের কথা রক্ষা করা সেদিন সম্ভবপর হয় নি তাঁর পক্ষে। আর্থিক দুঃখকষ্ট তাঁর চিরদিন ছিল, যেজন্যে হেমন্তকুমার সরকারের আহ্বানে তিনি সাড়া দিতে পারেননি। অসহযোগ আন্দোলনে হেমন্তবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেশসেবার কাজে অবতীর্ণ হলেন। তিনি শহীদুল্লাহ সাহেবকেও ডাক দিলেন। এবং বললেন যে দেশবন্ধু মাসে মাসে তাঁকে তিনশ করে টাকা দেবেন। শহীদুল্লাহ সাহেবের মন সেদিন সায় দেয় নি— দেশের কাজ করে টাকা নেবার প্রবৃত্তি তাঁর বিবেক তাঁকে বাধা দিয়েছে। তিনি বরং তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে যেদিন দেশের কাজ করব সেদিন জুটব কিন্তু এক হাতে টাকা আর এক হাতে কাজ তা তাঁর পোষাবে না। তাছাড়া আন্দোলনে নামলেই কি দেশের কাজ করা

যায়, তার বাহিরে কি দেশকে ভালবাসা যায় না ? ছাত্রদের পড়ানোর মাধ্যমে মানুষ করে তোলা, এও দেশের কাজ ; তা ইংরেজ-সৃষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয় হোক না কেন। আসল কথা হল দেশ ও মানুষের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে কিনা তা-ই খতিয়ে দেখা। তিনি একটি ভাষণে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, "আমি কখনই শিক্ষায় নন্-কো-অপারেশন বুঝতে পারি নি। মানি বর্তমান শিক্ষায় অনেক দোষ আছে। তাতে পেটে ভাত জোটে না, মাথায় স্বাধীন চিন্তা খেলে না, ধর্ম থাকে না, জাতীয়তা গড়ে ওঠে না, কেউ মানুষ হয় না— এইরকম কথা এক সময় প্রত্যেক প্লাটফরম থেকে ছেলেদের বলা হয়েছে।... আমাদের রাজনীতিকেরা চেষ্টা করুন দেশে স্বরাজ্য আনতে আর আমরা চেষ্টা করি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বরাজ্য আনতে।... চাকরী গোলামী নয় ; চাকরী দেশের সেবা। আমরা যত পরিমাণে রাজকাজে ঢুকব আর যত উঁচুপদ আমরা পাব, তত আমরা স্বতন্ত্র হ'লাম। ভেবে দেখ, দেশের সব কাজে যদি কেবলই বিদেশী থাকে, তবে আমাদের অবস্থা কেমন হয়। চাকরী গোলামী সেখানে, যেখানে ন্যায়, বিবেক, ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রীতি সব বিসর্জন ক'রে কেবল অত্যাচারী রাজশক্তির কেউ সাহায্য করে। এখানে গোলামীর দিকে ঝুঁকিটা বড় বেশী। তাই চাই সে সব স্বদেশ-প্রেমিক যুবকের সেখানে যেতে, যারা শত প্রলোভনের মধ্যে শত তিরস্কারের মধ্যে তাদের ব্রতে স্থির থাকবে।" (নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন : অক্টোবর ১৯২৮) লেখার মাধ্যমে চিন্তার মাধ্যমে শহীদুল্লাহ সাহেব আজীবন তার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। দেশ ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালবাসা আজ প্রবাদে পরিণত।

সারা জীবন আশুতোষ শহীদুল্লাহ সাহেবের অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের প্রতি সযত্ন ছিলেন কিন্তু একবার ঘটনাচক্রে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেবের ছাত্রজীবনে সে ঘটনাটি ঘটেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১০ সালে শহীদুল্লাহ সাহেব সংস্কৃতে এম. এ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু একজন কট্টর সংস্কৃত পণ্ডিত ম্লেচ্ছকে সংস্কৃত পড়াতে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে অবিলম্বে পাঠকক্ষ ত্যাগ করতে

আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেজিস্ট্রার মিঃ থিবোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু মিঃ থিবো নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে জানালেন যে কাশীতে তাঁকেও হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সংস্কৃত পড়তে দেওয়া হয় নি। কাজেই স্যর আশুতোষের গোচরে বিষয়টি আনার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিলেন। আশুতোষের বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি বিষয়টি মনোযোগ সহকারে শুনলেন, কিন্তু প্রতিকারের পথ তিনি করে দিতে পারেন নি। প্রথমতঃ পণ্ডিতরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করবেন এবং শত বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে তিনি যে ভারতের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের চেষ্টা করছেন, তার গড়ার যুগে ভাঙন তিনি সহ্য করতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বিধবা কন্যা কমলার দ্বিতীয় বার বিবাহ দেবার সময় পণ্ডিতরা যেভাবে তাঁর পিছনে লেগেছিলেন এবং ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে মেয়েটি পুনরায় বিধবা হল সেজন্যে আশুতোষের মানসিক অবস্থা শান্ত ছিল না। যদিও এ ঘটনা ১৯০৮ সালের তবু প্রিয়তমা কন্যার পুনরায় বৈধব্যবেশ তাঁকে সারাজীবন দুঃখ দিয়েছে। তিনি তাঁকে অন্য বিষয়ে এম. এ. পড়ার পরামর্শ দিলেন এবং কথা দিলেন যে ভবিষ্যতে বাইরে কোথাও গিয়ে সংস্কৃত শেখার সুযোগ থাকলে তিনি তাঁর জন্য চেষ্টা করবেন। কথা তিনি রেখেছিলেন। ১৯১৩ সালে বিদেশে সংস্কৃত পড়ার সুযোগ এসেছিল, আশুতোষ উচ্চ প্রশংসা করে তাঁর সুপারিশ পত্র রচনা করেছিলেন। আশুতোষের প্রতি শহীদুল্লাহ সাহেবের ঋণের অন্ত নেই। তাঁর জীবনে আশুতোষের প্রভাব অনেকখানি— খ্যাতি-প্রতিপত্তির মূলে আছেন আশুতোষ আর আছে তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা। আশুতোষের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলা সাহিত্যের কথার' দ্বিতীয় খণ্ড তাঁরই পুণ্যনামে তিনি নিবেদিত করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আর একজন গুণগ্রাহী ব্যক্তির কথা বলতে হবে। তিনি হচ্ছেন দীনেশচন্দ্র সেন। শহীদুল্লাহর প্রতি আশুতোষের ভালাবাসা যদি পিতৃস্নেহ হয়, তবে দীনেশচন্দ্র সেনের ভালবাসাকে কনিষ্ঠের প্রতি অগ্রজের স্নেহ বলা যেতে পারে। আশুতোষ শহীদুল্লাহকে ২০০৲

বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ-এ্যাসিস্টেন্টের (Research Assistant) পদে অর্থাৎ দীনেশ সেনের সহকারীরূপে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণার পদে নিয়োগ করেন। আজকালকার দিনে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-সহকর্মীদের মধ্যে সহমর্মিতার যথেষ্ট অভাব— শিক্ষক-অধ্যাপক-লেকচারার শ্রেণীর মধ্যে একধরণের ধনী-দরিদ্র সম্পর্ক বিদ্যমান, এক শ্রেণী তাঁর নীচু শ্রেণীকে অসীম কৃপা ও করুণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু তখনকার দিনে ঐ রকম সম্পর্ক ছিল না — অধ্যাপকরা তাঁদের অধঃস্তন লেকচারার কিংবা রিসার্চ-এ্যাসিস্টেন্ট-দের নিজেদের পরমাত্মীয় বলে মনে করতেন— একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করতেন। আজকালকার মত তাঁরা হাই পেডিগ্রিতে ভুগতেন না। দীনেশ সেনের ত কথাই নেই— বাংলা যাঁরা পড়াতেন কিংবা বাংলা ভাষায় যাঁরা গবেষণা করতেন তাঁদের তিনি আপনজন বলে মনে করতেন। দীনেশ সেন যে শহীদুল্লাহকে স্নেহ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যখন শহীদুল্লাহ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের পদের জন্য আবেদন করেছিলেন তখন দীনেশ সেন তাঁকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর বেতন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আশুতোষের কাছে দরবার করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি "আশুতোষ-স্মৃতিকথা" (১৯৩৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল ; · তাঁহারা অধ্যাপকদিগকে উচ্চ বেতন দিতে প্রস্তুত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা এখানে যত বেতন পাইতেন, কোন কোন স্থানে তাহার দ্বিগুণ বেতনের আশা তাঁহারা পাইলেন। এই আকর্ষণ আশুতোষের অনুরাগী দলের মধ্যে অনেকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।···অর্থের লোভ প্রতিরোধ করা পরিবার-দায়গ্রস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে অতি কঠিন।···শহীদুল্লা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-বিভাগে ২৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন, ঢাকা হইতে তাঁহাকে ৪০০৲ টাকা বেতন দেওয়ার প্রস্তাব আসিল। শহীদুল্লা আমাকে বলিলেন, 'আর ৫০৲টি টাকা আশুবাবু আমাকে বাড়াইয়া দিন,

আমি থাকিয়া যাইব—আমার পরিবার বৃহৎ। আমার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।' শহীদুল্লা বাঙ্গালা বিভাগে ছিলেন, আশুতোষ জানিতেন, ইহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ; ইনি ইংরাজী, ফরাসী, উর্দু, আরবী, পার্শী, সংস্কৃত, প্রাচীন বাঙ্গালা প্রভৃতি বহু ভাষাক্ষেত্রে শুধু কৃতী নহেন, বিশেষজ্ঞ। আমি বলিলাম—'এরূপ লোককে ৫০টি টাকা বাড়াইয়া রাখা উচিত।'...আশুতোষ বলিলেন —'আপনি শুধু শহীদুল্লাকে দেখিতেছেন, আর ১০।১২ জন অধ্যাপককে দেখিতেছেন না। সকলেব উপরই যে আকর্ষণ আসিয়াছে, অনেকেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য পা বাড়াইয়া আছেন, কিছু কিছু বেতন বাড়াইয়া দিলে ইহাদের অনেকেই থাকিয়া যাইবেন; আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ তাঁহারা অনেক লোভ সংবরণ করিতে প্রস্তুত। কিছু বিবেচনা আমরা করি, এইরূপ ন্যায্য দাবী অবশ্যই তাঁহারা করিতে পারেন। শহীদুল্লাকে ৫০৲ টাকা বাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে যে, মাসিক ২।৩ হাজাব টাকা আমাকে সর্বসাকুল্যে বাড়াইবার ব্যবস্থা করা। কাহারও নিকট প্রস্তাব আসিয়াছে এবং আর কাহারও দিকট প্রস্তাব আসিবে। সকলেরই বেতন বাড়াইবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হইয়া শহীদুল্লার বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে। আর যাঁহারা অপর স্থানে যাইতে প্রলুব্ধ হইবেন না, অথচ এখানে যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছেন, সহকর্মীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করাও তো সঙ্গত হইবে নাকো।' কিছুক্ষণ থামিয়া তিনি বলিলেন—'এইরূপ প্রলোভনে যাঁহারা ছাড়িয়া যাইবেন, তাঁহাদের দাবীর প্রশ্রয় দেওয়াও আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। যে কেহ অপর স্থানে বেশী টাকা পাইয়া যাইবেন, তিনিই ঐরূপ দাবী উপস্থিত করিবেন। স্বাভাবিক ক্রমে এইস্থানে থাকিয়া যাঁহারা বেতনের উন্নতির প্রত্যাশা করিবেন, আমরা যদি যথাসময়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে অবশ্যই তাহা করিব। আমাদিগের উপর এই বিশ্বাসটুকু না থাকিলে আমরা কি করিতে পারি? আমাদের এখনকার অর্থ-সঙ্কটের কথা তো কাহারও অবিদিত নাই'।" (৮৫-

৮৭ পৃঃ) তিনি তাঁর অর্থাভাব ও সাংসারিক কষ্টের কথা জানতেন। আশুতোষ যখন বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে অক্ষমতা জানালেন তখন তাঁকে তিনি বলেছিলেন যে কয়েকটা বছর কষ্ট করে থাকলে অবসর গ্রহণের পর তাঁর পদে যাতে শহীদুল্লাহকে নিয়োগ করা হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেবের পক্ষে অপেক্ষা করার উপায় ছিল না— ভবিষ্যতের আশায় বসে হাতের নগদটিও যাবে আর ভবিষ্যতেও যদি ফস্কে যায় তাহলে সব কুলই ভেস্তে যাবে। তাই সাত-পাঁচ ভেবে তিনি নিজের সংকল্পে অবিচল রইলেন। দীনেশচন্দ্র সেদিন তাঁকে যা বলেছিলেন অবসব গ্রহণেব সময় তা তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটিতে শহীদুল্লাহর নাম প্রস্তাবও কবেছিলেন। তিনি ছাড়া 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদের প্রার্থী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, বায় বাহাদুব খগেন্দ্রনাথ মিত্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমাব দে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় (শনিবারেব চিঠি, প্রবাসী প্রভৃতি) অধ্যাপক নিয়োগ করার বিষয় নিয়ে আলোচনাও চলে। প্রবাসী ১৩৩৯ শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিবিধপ্রসঙ্গ'-এ বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকতা" শিরোনামায় লিখেছিলেন—

> রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের জায়গায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন বাংলা সাহিত্যেব অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন। শুনিলাম, এই পদ চান অনেকেই। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, বায় বাহাদুব খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডক্টর সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতির নাম এই সম্পর্কে শুনা যাইতেছে। ইহাদের প্রত্যেকের পাণ্ডিত্য ও অন্যবিধ যোগ্যতাব বর্ণনা ও বিচাব করিবাব ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহা করিবার ইচ্ছাও নাই। এবং যাঁহাদের নাম শুনা যাইতেছে তাঁহারা প্রত্যেকেই বাস্তবিক ঐ পদ চান কি-না, ঠিক না জানিয়া ওরূপ কোন আলোচনা সঙ্গতও হইবে না। তবে, কে অধ্যাপক হইলে কি শিখাইবেন সেরূপ অনুমান করিতে দোষ নাই— যদিও তাহা বাজে কথার সামিল মনে হইতে পারে। প্রমথনাথ চৌধুবী মহাশয় অধ্যাপক হইলে বাক্যের বীরবলী কসরৎ এবং চিন্তা ও রসিকতার বীরবলী জিমন্যাষ্টিক বোধ করি শিখাইবার চেষ্টা করিবেন

না। কারণ, এগুলি তাঁহার নিজস্ব জিনিষ, কাহাকেও শিখান যায় কি-না সন্দেহ। তবে তিনি কথিত বাংলায় সাহিত্য রচনা করিতে শিখাইতে পারেন। তাহাতে ছাত্রদের ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপকার হইবে। অবশ্য বর্তমান লেখকের মত "রেঢো" মনুষ্য এবং অনেক বাঙাল মনুষ্য কলিকাতার কথিত বাংলা চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা সত্ত্বেও আয়ত্ব করিতে পারে নাই, পারিবে না। সেটা করা যে অসাধ্য, তাহা নহে। কলিকাতার কথিত বাংলা সব স্থলে আমাদের ভাল লাগে না, তাই আমরা তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি না। রাজধানীর কথিত ভাষা যে সর্বোৎকৃষ্ট তাহা স্বতঃসিদ্ধও নহে। লণ্ডনের কক্নী ভাষা ও উচ্চারণ তাহার প্রমাণ।

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অধ্যাপক নির্বাচিত হইলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কীর্তন ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা সম্বন্ধে কেবল যে বক্তৃতা করিবেন তাহা নহে, তত্তদ্বিষয়ে অবজেক্ট লেসনও দিতে পারিবেন। তাহা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিউটের মত আকর্ষণের বস্তু করিবে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকের অন্যান্য কাজ ছাড়া হয়ত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিবার ফন্দী ছাত্রদিগকে শিখাইবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে বেকার অলস মাসিকপত্র-সম্পাদকদের কাজ বাড়িয়া যাইবে, অনেক নূতন লেখকই ছোট গল্প পাঠাইয়া "উৎসাহিত" হইতে চাহিবেন এবং তাঁহাদের রচনা পাঠাইবার সময় সম্পাদকদিগকে চিঠি দ্বারা অনুরোধের ছলে এই উপদেশ দিবেন, যে, তাঁহারা কেবল নূতন লেখক বলিয়াই যেন তরুণদের রচনাবলী "অমনোনীত" না করেন।

ডক্টর সুশীলকুমার দে অধ্যাপকের অন্যান্য কাজ ছাড়া ছাত্রদিগকে হয়ত কবিতা লিখিতেও শিখাইবেন। তাহাতে সম্পাদকের আপিসের শুষ্ক আবহাওয়া ভাববাষ্পাকীর্ণ এবং কখন কখন উল্লাস-উচ্ছ্বাসপূর্ণ, কখন বা হা-হুতাশে "মুখরিত" হইয়া উঠিবে।

ডক্টর পণ্ডিত মাওলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তাঁহার সংস্কৃত আরবী ও ফরাসীতে বিদ্যাবত্তাবশতঃ দীনা বঙ্গভাষার ধনদৌলত অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। কারণ ডক্টর পণ্ডিত মাওলবী মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ বাংলা তাঁহার ছাত্রদিগকে শিখাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন—

"পূর্বদিকে আসমানের লম্বা লম্বা শাদা রেখা দেখা যাইতেছে।" "তাহারা সকলে বেগোনাহ"। "অন্যান্য পয়গম্বরের উপরও কিতাব নাযেল হইয়াছিল"।

"পরলোকের উপর ঈমান আনিবে," "তক্‌দীরের উপর ঈমান আনিবে," "আখেরাতের উপর ঈমান আনিবে।" উক্ত ডক্টর সাহেবের "মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা," ২য় ভাগ।

"মদিনাতেই তিনি এন্তেকাল করেন"। "কৃতজ্ঞতা=শোকরগুযারি"। "মাহাত্ম্য=বোযর্গি"। "মহাপাপ=কবীরাহ, গোনাহ"।—উক্ত লেখকের "মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা", ৩য় ভাগ।

"মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা" ২য় ভাগের শব্দার্থেব মধ্যে আছে, "দুরাত্মা=গরীব," "ইতর প্রাণী=মানুষ ভিন্ন অন্য জানোয়াব"।

চতুর্থভাগেব কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। "জননীও জান্নাৎবাসিনী হয়েন"। "অর্ণবপোতাদির আবিষ্কার হওয়াতে পানিপথে বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে"। ইহা যুদ্ধেব পাণিপথ নহে, বাণিজ্যের জলপথ। জলপথ বলিলে "গোনাহ" হইয়া যাইত, কারণ হিন্দুরা জলপথ বলে। "পানি" অবশ্য পানীয় হইতে উৎপন্ন। কিন্তু জলেব মত দুধ সরবৎ সুরা প্রভৃতিও "পানীয়"। সুতরাং জল ও পানীয় সমার্থক নহে।

প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্যের একটি ক্ষেত্রে একটু ত্রুটি ছিল, সেটি অবশ্য তিনি পরবর্তী সংখ্যায় স্বীকার করেছিলেন। ত্রুটিটি হল যে "মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা" ৪র্থ ভাগ শহীদুল্লাহ সাহেবের রচনা নয়, ঐ খণ্ড মৌলবী মোবারক আলী রচিত। 'শনিবারের চিঠি' তার স্বভাব সুলভ ব্যঙ্গে প্রত্যেক পদপ্রার্থী সম্পর্কে একটি করে কবিতা লেখেন। শহীদুল্লাহ সম্পর্কিত কবিতাটি নীচে দেওয়া হল—

: সংস্কৃত জানা পণ্ডিত তবু মাথায় ফেজ,
হাফিজে মারিয়া অমর কবিতে রজনী জাগে,
হে সাকী, পেয়ালা এনো নাকো, আন মদের ভাঁড়,
ভাষা যত খাঁটি ভালবাসা তত বক্ষে বাজে!
প্যারিস কোথায়, কোথা পার্সিয়া, কোথায় ঢাকা,
হাফিজে চাহিয়া কলিকাতারও যে চোখেতে পানি।
দু'কান কাটিয়া বেঁড়ে ক'রে দিল মোহম্মদী
[illegible]ায় ভারণাকুলার ভাল যে ছিল।

(টুকরি : শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)

কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে দীনেশ সেনের পর বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর নিয়োগে দেশের বিদ্বৎসমাজ ক্ষুব্ধ হন—যোগ্য লোক নিযুক্ত হন নি বলে 'শনিবারের চিঠি'তে বিষোদ্গার করা হয়। প্রবাসী-সম্পাদকও প্রতিবাদে লেখেন—

> শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র দীর্ঘকাল স্কুল-ইন্সপেক্টরেব এবং কলেজের অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যে বিষয়েব অধ্যাপনাব জন্য নিযুক্ত হইলেন, তাহাব অধ্যাপনা তিনি কখনও কবেন নাই, বিশেষ আলোচনাও করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।...সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্ব উভয়দিকেই তাঁহা অপেক্ষা নিঃসন্দেহ যোগ্যতর লেখক ছিলেন।...
>
> লেখক বা সাহিত্যিক হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুবীকে আবেদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলেই স্বীকাব কবিবেন।...অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষাতত্ত্বের প্রভূত জ্ঞান আছে। হয়ত আবেদকদেব মধ্যে তিনিই এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—যদিও এবিষয়ের চর্চা আমবা কবি নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। ডক্টব শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত, আরবী, পাবসী প্রভৃতি ভাষা জানেন। অধ্যাপক সুনীলকুমাব দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব তত্ত্ব এবং ইতিহাস জানেন।...
>
> ভাল কীর্তনিয়া এবং সুগায়ক বলিয়া খগেন্দ্রবাবুব লোকরঞ্জনের ক্ষমতা আছে। যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব অধ্যাপনার জন্য একান্ত আবশ্যক যোগ্যতাতে তিনি অন্য যে-কোন আবেদকের সমকক্ষ হইতেন, তাহা হইলে সঙ্গীত বিষয়ে গুণশালিতার জোরে তিনি যোগ্যতম বিবেচিত হইতে পারিতেন। (বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকাদি নিয়োগ : বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৯)

তখন আশুতোষ জীবিত ছিলেন না (মৃত্যু তারিখ ১৯২৪, ২৫শে মে) —বেঁচে থাকলে কী হত বলা যায় না, হয়ত বসিরহাটের মানুষটিকে চিরকালের মত ঢাকায় থাকতে হত না। দীনেশ সেনের স্নেহকে তিনি কোনদিন অমর্যাদা করেন নি। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছিলেন. "আজ

যাঁহারা বাঙলায় এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং করিতে যাইবেন তাঁহারা যেন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।" (আমার শ্রমের সার্থকতা : ঘবের কথা ও যুগসাহিত্য) শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর অগ্রজের ঋণশোধ করেছেন বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস লিখে এবং প্রথমখণ্ড তাঁর নামে উৎসর্গ করে।

বহুভাষাবিদ আচার্য হরিনাথ দে ছিলেন শহীদুল্লাহ সাহেবের মাস্টার মশাই। প্রেসিডেন্সী ও হুগলী কলেজে পড়ার সময় হরিনাথ দে'র সংস্পর্শে আসার তাঁর সৌভাগ্য হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ. পড়ার সময় হরিনাথ দে ছিলেন ঐ কলেজের অধ্যাপক ; হুগলী মহসীন কলেজে বি. এ. পড়ার সময় ঐ কলেজের তিনি কিছুদিন অধ্যক্ষ ছিলেন। হরিনাথ দে তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কলেজে পড়াব সময় তিনি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়তে দিতেন এবং কোন্ কোন্ বই পড়লে সত্যিকাবের জ্ঞানার্জন হতে পারে তার তালিকা তৈরী করে দিতেন। প্রতিদিন কলেজ কবার পর শহীদুল্লাহ সাহেব সেই তালিকা অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে (অধুনা ন্যাশনাল লাইব্রেরী) বসে রাত্রি ৮।৯টা পর্যন্ত পড়তেন। সংস্কৃতে এম. এ. পড়তে গিয়ে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার প্রতীকারের পথ না পেয়ে তিনি তাঁর হিতৈষী অধ্যাপক হরিনাথ দে'র সঙ্গে দেখা করেন— তখন হরিনাথ দে ছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। শহীদুল্লাহ সাহেবের বক্তব্য গভীর বেদনার সঙ্গে শোনার পর তিনিও তাঁকে কোন উপায় বাতলিযে দিতে পারেন নি। প্রাইভেটে সংস্কৃত নিয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিলে ফল ভাল হবে না, কারণ খাতা সেই কট্টর ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের হাতেই পড়বে এবং খাতার ওপর মুসলমানী নাম দেখলেই তাঁদের ভেতরের জন্তুটা লিকলিকিয়ে উঠবে— ফেল হবার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। কাজেই তাঁকে তিনি অন্য বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসেই তাঁর মনে একাধিক ভাষা আয়ত্ব করার আগ্রহ জন্মে। শহীদুল্লাহ সাহেব বাংলা

ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মৈথিলী, হিন্দী, ওড়িয়া, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, পুস্তু, উর্দু, আরবী, ফারসী, আবেস্তান, তিব্বতী, হিব্রু, প্রাচীন সিংহলী, জার্মান, ফরাসী ভাষা জানেন।

শহীদুল্লাহ সাহেবের জীবনে আশুতোষ, দীনেশচন্দ্র ও হরিনাথ দে'র প্রভাব অপরিসীম। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে গিয়ে ছাত্রদের পুত্রতুল্য জ্ঞান করা আশুতোষেব প্রভাব, সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ ও সাহিত্যানুসন্ধিৎসা দীনেশ সেনেব প্রভাব এবং বহুতর ভাষার ওপর আয়ত্তি হবিনাথ দে'র প্রভাব।

তিন

আনুমানিক চতুর্দশ শতকের প্রথমের দিকে সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী নামে এক সাধক পুরুষ ২৪ পরগণায় ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে এসেছিলেন। এই সাধকপুরুষ সাধারণ্যে 'পীর গোরাচাঁদ' নামে খ্যাত। এই সাধক পুরুষের সমাধিক্ষেত্র হাড়োয়া গ্রামে আজও রয়েছে। এই পীরের সেবক হিসেবে আসেন শহীদুল্লাহ সাহেবের আদি পুরুষ সেখ দারা মালিকী। তিনি পীরসাহেবের সমাধিস্থানের কাছাকাছি পেয়ারা গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর অধঃস্তন পুরুষরা বংশানুক্রমে পীরের দরগাহর সেবাইত হন। তাই শহীদুল্লাহর জীবনে সুফী দরবেশের প্রভাব অনেকখানি এবং ধর্মীয় জীবনযাপনে তাঁর অসাধারণ উদার নিষ্ঠা তাঁর রক্তের মধ্যে বংশানুক্রমে প্রবাহিত। ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই শুক্রবার (আষাঢ় ২৭, ১২৯২) ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটের অন্তর্গত পেয়ারা গ্রামে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম হয়। তাঁর আকীকার (একুশ দিনের কাজ) সময় নাম ছিল মুহম্মদ ইব্রাহিম। শহীদে কারবালা মোহররমের চাঁদে মায়ের গর্ভে তিনি এসেছিলেন বলে শহীদ নামের সঙ্গে মিলিয়ে মা পুত্রের নাম দিয়েছিলেন শহীদুল্লাহ। আকীকার নাম মুছে গেল, শহীদুল্লাহ নামেই বিখ্যাত হলেন। পিতার নাম মফিজুদ্দীন আহম্মদ, মাতার নাম হুরুন্নেসা।

গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে পিতার কর্মস্থল হাওড়ায় জুনিয়ার হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯৯ সালে মাইনর (Middle English) পাশ করে হাওড়া জিলা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তাঁর বাড়ীতে আরবী-ফরাসী ভাষার চর্চা থাকলেও স্কুলের মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে তিনি ফারসী না নিয়ে দ্বিতীয় ভাষারূপে (Second-Language) সংস্কৃত গ্রহণ করেন এবং পরীক্ষায় প্রায়ই প্রথম হতেন। সংস্কৃতে প্রথম হওয়া সম্পর্কে তিনি আত্মস্মৃতিতে বলেছেন, "হিন্দু

সহপাঠীদের সাথে গলায় গলায় ভাব ছিল। তারা একদিন পণ্ডিত মশায়কে খেপাবার জন্যে এক নালিশের অভিনয় করে। তারা বলে, 'স্যার, আমরা বামন-কায়েতের ছেলে থাকতে, আপনি ঐ মুসলমান ছেলেটাকে বরাবর ফার্স্ট ক'রে দেন, এতে আপনি অন্যায় করেন।' তাতে তিনি বলেন, 'আমি কি করব ও সিরাজুদ্দৌলা লেখে ভাল; তোরা তো তেমন লিখতে পারিস না।' পণ্ডিত মশায় আমার নাম মনে রাখতে পারতেন না, তাই আমাকে সিরাজুদ্দৌলা বলতেন।" (আমার সাহিত্যিক জীবন: শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ) স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তিনি বাইরের বই প্রচুর পড়তেন আর বই পড়তে পড়তেই তাঁর একাধিক ভাষা শেখার ইচ্ছা হয়। স্কুলজীবনেই তিনি আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, উড়িয়া, গ্রীক, তামিল পড়তে শিখেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক রূপে পরে যে প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তার সাধনা এই স্কুলজীবন থেকেই শুরু। তাঁর "আমার সাহিত্যিক জীবন" পাঠ করে জানা যায় যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত এই স্কুল জীবনেই। বাংলা অক্ষরে আরবী অনুলেখনের নিয়ম, সংস্কৃত ও ফারসীর তুলনামূলক আলোচনা, হাফিজের গজল, সংস্কৃতের পদ্যানুবাদ ইত্যাদির দৃষ্টান্ত উক্ত স্মৃতিচারণে কিছু কিছু দিয়েছেন। ১৯০৪ সালে ঐ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসার কলেজ-বিভাগ ছিল না, প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন পড়তে হত।

১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে হুগলী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। প্রাচ্যবিদ্যা অধিগত করতে হলে আরবী-ফারসীর সঙ্গে সংস্কৃত জানা একান্ত আবশ্যক। এজন্যে বি. এ. তে তিনি সংস্কৃতে অর্নাস নেন। সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী। চুঁচুড়ায় অবস্থানকালে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। সহকারী শিক্ষকের পদগ্রহণ করে তিনি যশোহর জিলা স্কুলে চলে যান। শিক্ষকতা করতে করতে ১৯০৯ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেন কিন্তু

এগ্রিগেটে এক নম্বর কম থাকায় পাশ করতে পারেন নি। চাকরী ছেড়ে দিয়ে সিটি কলেজে সংস্কৃতে অর্নাস নিয়ে ভর্তি হলেন। ১৯১০ সালে সংস্কৃতে অর্নাসসহ বি. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। বেদের প্রশ্নপত্রে তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেছিলেন। মুসলমান ছাত্র হিসেবে তিনিই প্রথম সংস্কৃতে অর্নাস পান, তার ফলে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। কলেজ-জীবনে তাঁর সহপাঠী ছিলেন এ. এফ. রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ভূতপূর্ব উপাচার্য), সৈয়দ নসীম আলী (হাইকোর্টের বিচারপতি), আলতাফ আলী চৌধুরী (পাকিস্তানের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর পিতা), ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা (Indian Historical Quarterly'র সম্পাদক), বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় (ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি), বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি। ১৯১০ সালের ১০ই অক্টোবর ভাসলিয়া নিবাসী মুহম্মদ মোস্তাকিমের কন্যা মবগুবা খাতুনকে বিবাহ করেন।

সংস্কৃতে এম. এ. ও আইন একই সঙ্গে পড়া শুরু করেছিলেন। প্রায় দুমাস নির্বিঘ্নে কাটল। তৃতীয় মাসে বেদের অধ্যাপক হয়ে এলেন প্রখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী। তিনি মুসলমান ছাত্রকে বেদ পড়াতে অস্বীকার করলেন, দেবভাষা ম্লেচ্ছকে পড়িয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করতে পারবেন না, কাজেই শহীদুল্লাহকে সংস্কৃত পড়া ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা এমনকি কলেজ-জীবনের অধ্যাপকরা যেমন মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁকে প্রাইভেটে সংস্কৃত পরীক্ষা দিতে পরামর্শ দিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরলোক গমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্মরণ-সভায় (শ্রাবণ ২৩, ১৩২৭ঃ আগষ্ট ৮, ১৯২০ রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥ ; সভাপতি—রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর) শহীদুল্লাহ সাহেব এই কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আচার্য সতীশচন্দ্র আমার অধ্যাপক ছিলেন (প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়)। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সৌজন্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া-

ছিলাম। এত বড় পণ্ডিত অথচ এত উদার ও সরল প্রকৃতির লোক কখনও দেখি নাই। তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা অসাধারণ ছিল। আরব্য তর্কশাস্ত্র (Logic) সম্বন্ধে তিনি আমাকে আলোচনা করিতে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে আমি আরব্য তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিতে প্রতিশ্রুত হইযাছিলাম। যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সংস্কৃত ভাষায় এম. এ. পড়াইতে চান নাই, তখন তিনি আমাকে প্রাইভেট পবীক্ষা দিতে অনুবোধ করিযাছিলেন। তিনি আমার বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভুতি দেখাইয়াছিলেন।" (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণী)

মুসলমান ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালযে কেন সংস্কৃত পডতে দেওয়া হবে না তা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও শিক্ষিত সমাজে এক বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বাদানুবাদ চলে। বাঙলাদেশেব 'সঞ্জীবনী' 'হিতবাদী' 'নায়ক' 'The Bengalee' প্রভৃতি কাগজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তীব্রভাবে আক্রমণ কবা হয। সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে 'The Bengalee' কাগজে লিখে-ছিলেন, "The Pandits should be thrown into the holy water of the Ganges." মৌলানা মহম্মদ আলীও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিযেছিলেন। তিনি 'Comrade' পত্রিকায় "The Lingua franca of India" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "The student of classics would no doubt be attracted by the inexhaustible mines of literature and philosophy in Sanskrit and Arabic, and while we hope that Muslim scholars would learn Sanskrit in larger numbers than we do at present, we trust such incidents as the 'Sahidullah Affair', when a Pandit of Calcutta Uuiversity refused to teach Sanskrit to a Muslim student, would not recur."

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলায়তনকে ভাঙতে যখন পারা গেল না তখন

শহীদুল্লাহ সাহেব হরিনাথ দে'র পরামর্শক্রমে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে (Comparative Philology) এম. এ. পাশ করেন (১৯১২)। এই বিষয়ের তিনি ছিলেন প্রথম ছাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শেখার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁর উদ্যম ভাঙেনি। সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন— সুযোগ এসে গেল। ১৯১৩ সালে ভারত সরকার প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম কেন্দ্র জার্মানীতে সংস্কৃত শেখার একটি বৃত্তি ঘোষণা করেন। স্যর আশুতোষের সুপারিশে শহীদুল্লাহ সরকারের বৃত্তি পেলেন। কিন্তু নৌকো তীরের কাছে এসে ডুবে গেল। ভারত সরকার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের সামনে তাঁকে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর সহপাঠী আলতাফ আলীর পিতা বগুড়ার জমিদার নবাব আলী চৌধুরী বিদেশের জন্য শীতবস্ত্রাদি কিনে দিয়েছিলেন আর স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যাতে ভাল হয় সেজন্যে অধ্যক্ষকে দেওয়ার জন্য বত্রিশ টাকা দিয়েছিলেন, কারণ অধ্যক্ষের ঘুষ খাওয়ার বদনাম ছিল। তখন রমযান মাস চলছে— রোযা রেখেছেন। বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে রোযা ভেঙে চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হবার পরামর্শ দিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভাঙলে শাস্তিস্বরূপ ৬০টি রোযা রাখতে হয়— শাস্ত্রীয় বিধানকে তিনি লঙ্ঘন করতে চাইলেন না। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কোনদিন কোন কারণে কোন বছরের রোযা ভাঙেন নি। কিন্তু একবার তাঁকে রোযা ভাঙতে হয়েছে। ১৯৬৫ সালে জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে তবু নিজ সঙ্কল্পে অটল থেকেছেন। এক শুক্রবারের জামাতে নমাযের সময় তাঁর বুকের ধড়ফড়ানি শুরু হল। চিকিৎসক রোযা ভাঙতে বললেন। কিন্তু জীবনের মূল্য আল্লাহর রোযা থেকে বেশী নয় তাঁর কাছে, তাই সেদিন তিনি কিছুতেই রোযা ভাঙলেন না। কিন্তু তাঁর বুকের ব্যথা ক্রমশঃ বেড়ে চলল। অবশেষে সকলের অনুরোধে একদিন রোযা ভাঙবেন ঠিক হল, কিন্তু কার্যত তাঁকে তিনদিন রোযা ভাঙতে হয়েছে। ২১শে রমযান থেকে ইতিকাফে (নির্জনবাস) যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে চিকিৎসক ও আত্মীয়-স্বজনরা শেষ তিনদিন

ইতিকাফে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁদের ব্যাকুলতা তাঁকে বিচলিত করল— অবশেষে তাঁদের কথাই তিনি শিরোধার্য করে নিলেন। বার্ধক্যের অসুস্থতাহেতু এতাবৎকালের মধ্যে একবারই তাঁকে রোযা ভাঙতে হয়েছে কিন্তু কোন পার্থিব লাভের বিনিময়ে তিনি তাঁর নিয়মনিষ্ঠা থেকে কোনদিন বিচ্যুত হন নি। রোযা রেখেই অধ্যক্ষের কাছে গেলেন। স্বাস্থ্য তাঁর বরাবর ভাল ছিল, কিন্তু ঘুষ না দেওয়ার দরুণ রিপোর্ট তাঁর বিপক্ষে গেল। নবাব সাহেব পরে মেডিক্যাল কলেজের আর একজন চিকিৎসকের কাছে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট যথাযথস্থানে যখন পাঠিয়েছিলেন তখন দেরী হয়ে গিয়েছে, জার্মানীতে ভর্তি হবার তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে।

সুযোগ যখন হাতছাড়া হয়ে গেল তখন দেশে থেকেই পড়াশুনা করবেন বলে মনস্থ করলেন। কালক্রমে নিজস্ব চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা করে তিনি বিশেষজ্ঞরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৪ সালে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুশীলকুমার দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক শাহেদ সোহরাওয়ার্দী, মুহম্মদ আকরাম (পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি) প্রভৃতি তাঁর আইনের সহপাঠী ছিলেন। আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকার জন্য এম. এ. ও আইন পড়ার সময় তিনি কিছুদিন কলকাতার সৈয়দ সালেহ লেনে অবস্থিত মুসলিম এতিমখানার ম্যানেজারি করেন (১৯১২-১৩)। বি. এল. পাশ করার পর আর মওলানা মনিরুজ্জমান সাহেবের অনুরোধে প্রধান শিক্ষক রূপে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে শিক্ষকতা ছেড়ে ২৪ পরগণার বসিরহাট কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এই সময় তিনি বসিরহাট পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান ও ২৪ পরগণা জেলাবোর্ডের সদস্য ছিলেন। সরকারী কাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না বলে ওকালতীতে এসেছিলেন— এসে দেখলেন এখানে সত্যের কোন বালাই নেই, টাকার জন্য দিনকে রাত, রাতকে দিন বানানো যায়। বৃত্তির সঙ্গে প্রাণের মিল

পেলেন না, আবিলতা আবর্জনার মধ্যে সুকুমারবৃত্তির চর্চা অধিকদিন চালানো সম্ভবপর হবে না বলে তাঁর মনে হল, যদিও তাঁর ওকালতী ভালই চলছিল। মোকদ্দমার নথিপত্র আর আইনের কেতাব-ঘেরা সীমাবদ্ধ ছোট-জীবন থেকে তিনি মুক্তি পাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠলেন। উকীলদের সম্বন্ধে রজনীকান্ত সেনের রসিকতাপূর্ণ কবিতাটি ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অন্তরের কথা। তিনি প্রায়ই ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করতেন—

: আমরা বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমাব মামলা অতি ভাল।"
আবাব, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।"

দুটো খেয়েই কাছাবী ছুটি,
আর যা' পাই থল্‌সে পুঁটি,
ঐ জল কাদা-ভেঙে, যার যাব মত,
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি।

দেখ, বড়ই হা-ভাতে 'হরি বোস',
পাঁচ টাকাব কমে নাই পরিতোষ,
তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ-অঙ্গুলি দেখায়ে,
উঠে এলো, ভারি কবি বোষ ,

তখন আমি শ্রী 'নিঃস্বার্থ চাকী',
"এস চাচা মিঞা" ব'লে ডাকি ,
"আরে দু'টাকায় আমি ক'রে দেবো চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি ?"

তখন, চাচাও দেখলে সস্তা,
রেখে গেল কাগজের বস্তা,
চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি,
ও বাবা, এ দু'টো যে দস্তা !

দুর্দশার কি দিব বর্ণ ?
দেখ, হ'য়েছি বেহায়ার হদ্দ ;
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ। (উকিল : কল্যাণী)

কোর্টে মানুষের ধূর্তামি দেখে অবাক হয়ে যেতেন আর ঐ ধূর্ত লোকদের খালাসের জন্য উকিলরা ওকালতী করেন ; তাই বি. এল. ডিগ্রীর তিনি নতুন নামকরণ করেছিলেন 'Bad livelihood'। ওকালতী ত্যাগ করার সংকল্পই তিনি করলেন। ঐরূপ মানসিক চাঞ্চল্যের সময় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০) তাঁকে "আঞ্জুমানে-ওলামায়ে বাঙ্গালা" নামক ইসলাম মিশনে যোগদান করতে অনুরোধ জানালেন।

আইন-ব্যবসা ছাড়লেও একটা নিশ্চিত আয়ের পথ দেখতে হবে। ইসলাম মিশনে যোগ দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না, তবে খালি পেটে ধর্ম হয় না। মাসিক দেড়শো টাকার কমে তাঁর সংসার চলে না। কাজেই ঐ পরিমাণ বেতন তিনি ইসলাম মিশনের কাছে চাইলেন। কিন্তু মিশনের পক্ষে ঐ টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে মুসলিম মিশনারী হওয়া তাঁর আর হল না। ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে না পারলেও ইসলাম সম্পর্কে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে তিনি জাতীয় ঋণ শোধ করেছেন। এধারে সরকারী চাকরী করার বয়সও তখন তাঁর পেরিয়ে গেছে। মনের মত চাকরীর সন্ধানে থাকতে থাকতে স্যর আশুতোষের সঙ্গে তাঁর দেখা হল একদিন। ওকালতী কেমন লাগছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। ওকালতী তাঁব ভাল লাগছে না বলতেই আশুতোষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে 'শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা-সহায়ক' (Research Assistant) পদে নিয়োগ করেন। ১৯১৯ সালে ১৫ই জুন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। ইতিপূর্বে ওকালতী করার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় তাঁর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ বিদ্বৎ-সমাজের প্রশংসালাভ করে— স্যর আশুতোষেরও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ

হয়। আশুতোষ সেই প্রবন্ধ পাঠ করেই শহীদুল্লাহ সাহেবের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী দিয়েছিলেন। তাই স্যর আশুতোষের নামে 'বাংলা সাহিত্যের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ-পত্রে লিখেছিলেন, "যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 'Shahidullah, bar is not for you, come to University' ব'লে আমাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান ক'রে আমার জীবনেব গতিপথ বদলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পুণ্য শ্লোক স্যাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমর নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল।"

চার

ছাত্রাবস্থাতেই শহীদুল্লাহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছাত্র-সদস্য ছিলেন, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করার সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের ষড়বিংশ অধিবেশনে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭: ৩০শে মে ১৯২০ রবিবার) সর্বসম্মতিক্রমে ছাত্রাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ এবং সমর্থন করেছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। ১৩৩২ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তিনি অনেকগুলি ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। পরিষদের বিভিন্ন বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে সেই অধিবেশনের কয়েকটি বিবরণ, তৎসহ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের তালিকাও দিলাম—

: চতুর্বিংশ বর্ষ: নবম মাসিক অধিবেশন। ১৭ই চৈত্র ১৩২৪: ৩১শে মার্চ ১৯১৭, রবিবার অপরাহ্ন ৬॥। সভাপতি: সতীশচন্দ্র বায়।

এই অধিবেশনে শহীদুল্লাহর "বাঙ্গালা শব্দবোধ সম্বন্ধে আলোচনা" প্রবন্ধটি তাঁর অনুপস্থিতিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটি যোগেশচন্দ্র রায়ের শব্দকোষ সম্পর্কে আলোচনা এবং পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২৫-এর ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

সুনীতিবাবু প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের অগ্রণী সংস্কৃত আরবী ফার্সী ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত সাহিত্যিকের নিকট আমরা বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আশা রাখি।

এই উপলক্ষ্যে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মৌলভীসাহেব এই প্রবন্ধে ভাষাজ্ঞানের প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ॥

: পঞ্চবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন। ২৯শে ভাদ্র ১৩২৫ : ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গলা লিপ্যন্তর" নামে এক প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যায় বেরোয়। উক্ত প্রবন্ধের লিখিত সমালোচনা শহীদুল্লাহ এই অধিবেশনে পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধ "আরবী ও ফরাসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তব সমালোচনা" পরিষৎ পত্রিকার ১৩২৫-এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যাতেই তাঁর আলোচনার উত্তর (আরবী ও ফরাসী নামের বাঙ্গালা অক্ষরলিখন) দেন সুনীতিবাবু॥

: ষড়বিংশ বর্ষ : দশম মাসিক অধিবেশন। ৫ই বৈশাখ ১৩২৭ রবিবার অপরাহ্ণ ৬॥। সভাপতি : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শহীদুল্লাহ উপস্থিত না থাকায় তাঁর প্রবন্ধ "হেমচন্দ্রের দেশী নাম-মালা" সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পাঠ করেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত অমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই,— হেমচন্দ্রের দেশী নাম-মালার আলোচনা ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুইটির ১ম খণ্ডে বাহির হয়। বোম্বে ব্রাঞ্চ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি জার্ণালে ভাণ্ডারকর মহাশয়ও এই বিষয়ের বিচার করেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১১শ ভাগে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে আলোচ্য প্রবন্ধেব আলোচিত শব্দের মত শব্দসংগ্রহ ও আলোচনা করিয়াছেন। পিশেলেব প্রাকৃত ব্যাকরণে এই প্রবন্ধের প্রথম কয় পৃষ্ঠার সম্যক আলোচনা আছে। যাহা হউক, লেখক মহাশয় একটা দেশী শব্দের তালিকা দিয়াছেন। কিছু কিছু বিচারও করিয়াছেন। দেশী শব্দ বলিয়া হেমচন্দ্র নিজে যে সংগ্রহ দিয়াছেন, তাহাদের বার আনা শব্দই দেশী নয়। সে শব্দ সম্বন্ধে একটু বিচার থাকিলে ভাল হইত।

তৎপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—লেখক মুসলমান। এই সকল ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা তাঁহার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। আমরা তাঁহার উদ্যমে আনন্দিত। তিনি অতি ধীর প্রকৃতির লোক। এই প্রবন্ধের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। তাঁহাকে উৎসাহিত করা উচিত। প্রবন্ধের বিষয় ভাষা-তত্ত্ব, অতি কঠিন বিষয়, ইহার মীমাংসা একমুখে হয় না। একটা ভাষা দাঁড় করাইতে হইলে নানান ভাষা হইতে শব্দ ধার লইতে হয়— তখন ভাষা মিশ্র হয়; যেমন বাঙ্গালা ভাষা— ইহাতে পুর্তুগীজ আছে, সংস্কৃত আছে,

এমন বহু ভাষার শব্দ আছে। French Academy-র আদর্শে এই পরিষৎ গঠিত। এখানে ভাষা-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নানারকম বিষয় প্রবেশলাভ করিবে। রামেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ইহাকে National Institution করিয়া তুলিয়াছেন। এখানে দশজনে মিলিয়া একটা বিষয়ের মীমাংসা ও বন্দোবস্ত করেন। সেইরূপ ভাষা-তত্ত্বের বিষয়ও মীমাংসিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালা ভাষার মূল অনুসন্ধান করা বড় কঠিন কাজ। অমূল্যবাবু প্রাকৃত ব্যাকরণের কথা বলিয়াছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয় নয়— উহা বই হইতে তৈয়ারী, ভাষা হইতে নহে। বই হইতে যে ব্যাকরণ তৈয়ারী হয় তাহা বিজ্ঞানসম্মত নয়, ভাষা হইতে যে ব্যাকরণ তৈয়ারী হয় তাহা বিজ্ঞানসম্মত—যেমন পাণিনির ব্যাকরণ, উহা সমস্ত দেশের সমস্ত ভাষা একত্র করিয়া তৈয়ারী। হেমচন্দ্রের নাম-মালার বিশেষ বিচার হওয়া আবশ্যক। ভাষা-তত্ত্বের আলোচনার প্রণালী বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত॥

: সপ্তবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন। ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৭ : ১৫ই আগস্ট ১৯২০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬। সভাপতি : রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর। এই অধিবেশনে শহীদুল্লাহ "বৌদ্ধগান ও দোঁহা আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২৭, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ সংখ্যায় তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, এইরূপ ভাষাতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা আমাদের সাহিত্যের অনেক লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মৌলবী সাহেবের নিকট আমরা এ বিষয়ে অনেক আশা করি। সহজিয়া ধর্ম হইতে যে সকল সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহার গুরু অর্থ ও ভাষার দিক দিয়া অন্য অর্থ আছে। অনেক স্থলে শব্দের গুরু অর্থ করিতে গিয়া ভাষার অর্থ হয় নাই। এই সকল বিষয়ের যত আলোচনা হইবে ততই ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধলেখকের অনেক অর্থ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের বৌদ্ধগান ও দোঁহার আলোচনা শুনিলাম। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ঐ গ্রন্থের যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, শহীদুল্লাহ সাহেব তাহার ভুল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন

তাহাতে তাঁহার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই পাঠে ভুল নির্ণয় করিতে হইলে অন্ত একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করা আবশ্তক। তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহার একটা ব্যাখ্যা আছে। তাহাকে আলোচনা না করিয়া এবং বৌদ্ধগান ও দোঁহার ভিতরের ধর্ম কি, তাহা না বুঝিয়া পাঠের ভুল ধরিতে যাওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমাদের মনে হয়, তাঁহাব আলোচনাব দুইটি জায়গা ছাডা অন্ত কোনটিই বিচাবসহ হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ তাঁহাব দুই চারিটি কথার আলোচনা, এখানে করিব। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত এবং তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে, পুঁথির যে পাঠ ছাপা হইয়াছে, সেই পাঠেরই বেশ সুসঙ্গত অর্থ হয়। তাহাব স্থলে অন্তবিধ আনুমানিক পাঠ পবিকল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহা সঙ্গতও নহে।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বায় বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয় বলিলেন, ভাষাতত্ত্বেব আলোচনা, বিশেষতঃ প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন করিয়া— বিশেষ শক্ত কাজ। সম্পাদক মহাশয় যে সকল অর্থ পবিশ্রম সহকাবে করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক যেরূপ পরিশ্রম করিয়া তাহাদেব অর্থ করিয়াছেন, তাহা চিন্তার বিষয়। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনাকালে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন এবং অনেক আলোচনা এই বিষয়ে হইত। এখন পুস্তক প্রকাশিত (বৌদ্ধগান ও দোঁহা, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত) হওয়ার পর দেখিতেছি যে, গ্রন্থে বহু আলোচনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় আসে নাই। একখানি মাত্র পুঁথি দেখিয়া এই বই সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাঠবিকৃতি আছে কি না, নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না। ৩০ বৎসরেব উর্ধ্বকাল প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর পুঁথির পাঠ ভিন্ন ভিন্ন নকলনবীশের হাতে পড়িয়া পাঠান্তরিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের শব্দ ও অর্থ একত্র আলোচনা হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখককে ধন্তবাদ দিলেন॥

: ১৩৩১, ৩য় সংখ্যা— বাংলা ভাষায় অনুজ্ঞা, ৪র্থ সংখ্যা— কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী॥

: ১৩৩৩, ২য় সংখ্যায় শহীদুল্লাহর "সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কালনির্ণয়"

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধের মন্তব্য ও আলোচনা করেন আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ॥

: ১৩৩৭, ১৪ই ভাদ্র পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তাঁর "বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষার বর্তমান কালেব উত্তমপুরুষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এই প্রবন্ধটি ১৩৩৭, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধের আলোচনা করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥

: ১৩৪২, ১৯শে ফাল্গুন পবিষদেব নবম মাসিক অধিবেশনে তিনি "বড়ু চণ্ডীদাসের পদ" নামে প্রবন্ধ পাঠ কবেন। এই প্রবন্ধটি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত, পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী" প্রথম খণ্ডেব উপব আলোচনা। এই প্রবন্ধটি ১৩৪৩, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ সংখ্যায় সম্পাদকদ্বয় তাঁর প্রবন্ধের জবাব দেন ॥

: ১৩৪৮, ১ম সংখ্যা—ভুসুকু
২য় সংখ্যা— বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা
৪র্থ সংখ্যা— শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব কয়েকটি পাঠ বিচাব ॥

: ১৩৪৯, ১ম সংখ্যা— সিদ্ধাকানুপার দোহা ও তাহাব অনুবাদ
৩য় সংখ্যা— চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথিব পবিচয় ॥

: ১৩৫০, ৪র্থ সংখ্যা— সংস্কৃত ও পারসী ॥

বাকেরগঞ্জ জেলাব ভোলা শহবেব বাফতা গ্রামের মুহম্মদ মোজাম্মেল হকের সহযোগিতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পবিষদেব অনুকরণে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি" নামে তিনি এক সাহিত্য-সংগঠন গড়ে তোলেন। এটি কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না, যদিও নামটা সম্প্রদায়গত ছিল। নজরুল ইসলাম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মুজফফব আহমদ প্রভৃতি আসতেন এবং আড্ডা দিতেন। এই সাহিত্য-সমিতির নাম কেন "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি" দেওয়া হয়েছিল তার কৈফিয়তে শহীদুল্লাহ সাহেব বলেছেন, "আমবা কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু, মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমরা বড়লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়দের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায়

যোগদান করতাম। আমাদের মনে হলো বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ৯ নং আন্তনিবাগান লেনে মৌলবী আবদুর রহমান খানের বাড়ীতে ১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক সভা আহূত হয়।" মৌলবী আবদুল করিম ছিলেন সভাপতি, শহীদুল্লাহ ছিলেন সম্পাদক আর মুজফফর আহমদ ছিলেন সহকারী সম্পাদক। সমিতির অফিস ছিল ৪৭/১ মির্জাপুর স্ট্রীটে (অধুনা নাম সূর্য সেন স্ট্রীট)। শহীদুল্লাহ ও মোজাম্মেল হকের যুগ্ম-সম্পাদনায় সমিতির মুখপত্র "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা" বেরুতে শুরু করে (বৈশাখ ১৩২৫ : এপ্রিল-মে ১৯১৮)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "আমাদের ভাষা-সমস্যা" নামে তাঁর এক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ প্রবন্ধটি দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর (১৯১৭) সভাপতির ভাষণ। ঐ প্রবন্ধে বিশেষ করে মুসলমান সমাজের বাংলা ভাষা পাঠ ও পঠনের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। তাঁর মতে মক্তব-মাদ্রাসায় বাংলাকে অবশ্য পাঠ্য করা উচিত, আরবী-ফারসী-উর্দু-জানা মুসলমান বাংলা ভাষাকে অবহেলা করলে বাঙালী মুসলমানের দুরবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হবে না, ভাষার মাধ্যমেই যোগসূত্র রচিত হয়, কাজেই বাংলা ভাষাকে গোঁড়া ফারসীপ্রেমী ও সংস্কৃতপ্রেমী উভয়দলের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। ঐ প্রবন্ধে কলকাতা অঞ্চলের ভাষাই যে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ভাষারূপে গড়ে উঠছে তাকে তিনি সাদর স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ঐ ভাষণের একস্থলে তিনি বলেন, "পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে ? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্মের নিকট মাথা নত করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই···অনেক-দিন পূর্বে 'উর্দু বনাম বাংলা' মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার পক্ষে ডিক্রী হইয়া যায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দু-পক্ষকে সওয়াল-

জওয়াব করিতে শুনিতেছি।...দখল বাংলারই থাকিবে তবে উর্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু ভূমি বন্দোবস্ত পাইতে পারে।" অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে তিনি কী করে মুসলমানী বাংলায় মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। এ সম্পর্কে আলোচনা "শহীদুল্লাহর শিক্ষাচিন্তা" অধ্যায়ে করব।

সমিতিব কাজ বেড়ে যাওযায় ৩২ কলেজ স্ট্রীটে সমিতি স্থানান্তরিত হয। কিন্তু এ সময় শহীদুল্লাহ সাহেব বসিবহাটে ওকালতী করতেন। বিশ্ববিদ্যালযেব চাকবী নিযে তিনি সমিতিব অফিসগৃহে মুজফফর আহমদ সাহেবের সঙ্গে একই কামবায় ওঠেন। কিছুদিন পব ২৬, ফিয়ার্স লেনে মেডিক্যাল কলেজেব মুসলমান ছাত্রদের হোষ্টেলের অধীক্ষক নিযুক্ত হয়ে সেখানে উঠে যান। এইখানে মওলানা আবদুর রউফ দানাপুবী ও আজানগাছিব পীবসাহেবের সঙ্গে তাঁব পরিচয় হয় এবং তাঁদেব সঙ্গে তিনি কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতেন। বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করার আগ্রহ এই সময় তাঁর হয়। আববী ও ফারসীতে তাঁব জ্ঞানের পরিধি দেখে আজান-গাছির পীরসাহেব তাঁকে "বাহাব-উল-উলুম" (বিদ্যাসাগর) খেতাব দেন। আর সংস্কৃত ভাষায় তাঁর গভীব জ্ঞান, হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে ১৯৫২ সালে 'ঢাকা সংস্কৃত-পরিষৎ' তাকে "বিদ্যা-বাচস্পতি" উপাধি দেন এবং 'পূর্ববঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা উপদেষ্টা সংসদে'র সদস্য নির্বাচিত হন।

পাঁচ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যা বেতন পেতেন তা সংসারে কুলোতো না। ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে— শিক্ষাদীক্ষার খরচ আছে। অর্থাভাবে পবিবার নিয়ে কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হবাব পব প্রাচ্যবিদ্যাব ভাণ্ডাবী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে (১৯২১, ৩১ মে) আড়াই শ টাকা বেতনে ২রা জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগেব লেকচারাব নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার সঙ্গে অতিরিক্ত পঁচাত্তব টাকা বেতনে "সলীমুল্লাহ মুসলিম হলের" হাউস-টিউটর নিযুক্ত হন এবং বসবাসের জন্য ফ্রি কোয়ার্টার পান। ১লা জুলাই সরকারীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়েব উদ্বোধন হলেও কাজের সুবিধার্থে আগেই তাঁকে কাজে যোগ দিতে হয়। রীডার-শিপের জন্য তিনি আবেদন করেছিলেন কিন্তু বাংলা বিভাগে কোন রীডারেব পদ ছিল না বলে লেকচারার হন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯২১, ১৮ই জুন)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; ১৩২৭ (১৯২০) সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ছাত্র-সম্মিলনীতে "বাঙলা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় তাঁর বচিত প্রবন্ধ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব ভাষাতত্ত্ব এবং চর্যাপদের ওপর গবেষণাদি পাঠ কবে তিনি এমনই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তাঁকে নিজের সহকর্মী করে ঢাকায় এনেছিলেন। তাঁর ওপর শাস্ত্রী মহাশয়ের এমনই আস্থা ছিল যে বি. এ. পাশ-অনার্স ও এম. এ.'ব বাংলা সিলেবাস ও পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের ভার তাঁব ওপর অর্পণ করেছিলেন এবং সে দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসেবে বঙ্গীয়

সাহিত্য-পরিষদ থেকে নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিশিষ্ট লেখকদের ভারততত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ করে "হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা" দু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় (১৩৩৮)। আর দ্বিতীয় খণ্ড তাঁর মৃত্যুর (১৩৩৮, ১লা অগ্রহায়ণ : ১৯৩১, ১৭ই নভেম্বর) পর প্রকাশিত হয় (১৩৩৯)। উক্ত গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে শহীদুল্লাহ সাহেবের "প্রথম মহীপালদেব ও খিরল" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয়েব বৌদ্ধগান ও দোঁহা সম্পর্কে শহীদুল্লাহ সাহেবের মতান্তরের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। মাঝে-মধ্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কাল-নির্ণয়ে ও তথ্য-নিরূপণে উভয়েব মতেব অমিল থাকলেও সম্পর্ক ববাবর মধুর ছিল। ঢাকার 'প্রাচী' পত্রিকার ১৩৩০ আষাঢ় সংখ্যায় শহীদুল্লাহ সাহেব "প্রাচীন যুগেব বাঙ্গালা সাহিত্যেব ধাবা" শীর্ষক প্রবন্ধে ডাক ও খনার বচন সম্পর্কে বলেছিলেন, "যেমন বৌদ্ধ সমাজে ডাকের বচনের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ হিন্দু সমাজে খনাব বচনের সৃষ্টি হইয়াছিল।...পববর্তীকালে ডাক ও খনাব বচন বলিয়া যাহা লিপিবদ্ধ হইযাছে, ভাষা হিসাবে তাহা তত প্রাচীন না হইলেও, তাহাদের অনেকেরই কুব্‌ছীনামা মুসলমান আমলেব পূর্বে পৌছিবে।" ঐ বৎসবের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রাচী'তে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁব মত খণ্ডন করে বলেছিলেন, "...ডাক ও খনার বচন বৌদ্ধদেব নয়, হিন্দুর। তাও খুব পুরাণ নয়। মুসলমানের আমলের বটে. কিন্তু কত পুরাণ বলা যায় না। বোধ হয় পাঠান আমল হইতেই আরম্ভ, মোগল আমলে শেষ।" শাস্ত্রী মহাশয়ের অধীনে কাজ করে শহীদুল্লাহ সাহেব জীবনে উপকৃত হয়েছেন। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় বাজেন্দ্রলাল মিত্রের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা যেমন শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি শাস্ত্রী মহাশয়ের অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও ভাব-প্রকাশের সহজ সরল ঘরোয়া ভাষা শহীদুল্লাহ সাহেবকে অনুপ্রাণিত করেছে। "বিদ্যাপতিশতক" (১৯৫৪) গ্রন্থটি তাঁর নামে উৎসর্গ করে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন। উৎসর্গ-পত্রে বলেছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (১৯২১—২৪ খ্রীঃ অঃ) পিতামহপ্রতিম অশেষ শ্রদ্ধাভাজন সংস্কৃত ও বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক পুণ্যশ্লোক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েব স্মরণোদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সমর্পিত হইল।"

১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শাস্ত্রী মহাশয় অবসব গ্রহণ কবেন। তাঁর স্থলে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত হন। যেসময় চাকচন্দ্র 'প্রবাসী'তে কাজ করতেন সে সময় শহীদুল্লাহ সাহেব 'প্রবাসী'তে লিখতেন—লেখার সূত্রে আলাপ ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শ্রীশবাবুর পবে অধ্যক্ষ হন (১৯২৫) তাঁব আইন কলেজের সহপাঠী ডঃ সুশীলকুমার দে। ডঃ দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ইংবেজী বিভাগেব রীডাব ছিলেন। এঁর কার্যকালে মোহিতলাল মজুমদার বাংলা বিভাগেব লেকচাবাব হয়ে ঢাকায় আসেন। সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগেব অধ্যক্ষ হবার কথা ছিল শহীদুল্লাহ সাহেবের, কিন্তু তখন তাঁব বিদেশী কোন ডিগ্রী ছিল না। তিনি কারুর দয়ার ওপর নির্ভব না কবে আত্মমর্যাদাব সঙ্গে মাথা উঁচু করে কাজ কবে যাবেন, এই সংকল্প নিয়েই তিনি উচ্চতম উপাধি লাভের জন্য বিদেশ যাত্রার আয়োজন শুরু করলেন।

জার্মানীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের বৃত্তি পেয়েও তিনি ডাক্তারী রিপোর্টের জন্য যেতে পারেন নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি (প্রথম সাত মাস সবেতনে, বাকী মাস বিনা বেতনে) এবং সাত হাজার টাকা ধার নিয়ে ১৯২৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য রওনা হন। প্যারিস সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে (University de Paris or Sorbone) তিনি বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পারসীক, তিব্বতী ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। তাঁর অধ্যাপকদের মধ্যে Jules Bloch, Antoine Meillet, Benveniste, Jean Pruzuluski, Bacot, Renon নাম উল্লেখযোগ্য। প্যারিসের Archive de la perok বিদ্যালয়ে তিনি

ধ্বনি-বিজ্ঞান পড়ার জন্য ভর্তি হন, ধ্বনিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন H. Pernot। জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা অধ্যয়ন করেন। জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপক ছিলেন Leumann। ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি জার্মানী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করতে পারেন নি। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য-সম্বন্ধে ফরাসীভাষায় গবেষণা করে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম Tris honourable-সহ ডি. লিট ডিগ্রী পান। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ "Les Chants Mystiques de kanna at de Saraha" প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। এই গ্রন্থে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় এবং কাহ্ন ও সরহের অপভ্রংশ পদগুলির তিব্বতী অনুবাদও রয়েছে। এই গবেষণাগ্রন্থ রচনাকালে তাঁকে কি রকম পরিশ্রম করতে হয়েছিল সে-সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমাকে আমার Thesis উপলক্ষে বাঙ্গালা ব্যতীত আসামী উড়িয়া, মৈথিলী পূরবীয়া, হিন্দী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী, লাহিন্দা, কাশ্মিরী, নেপালী, সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চা করিতেছি। বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিরাট কার্যের জন্য বিরাট আয়োজন চাই। তিব্বতীও শিখিতেছি। কাজেই বুঝিতে পার আমার সময়ের উপর কিরূপ গুরুতর চাপ পড়িতেছে।" (প্যারীর পত্র: ৬. ১. ২৭) ধ্বনি-বিজ্ঞানে গবেষণা করে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ডিপ্লোমা (Diplo. Phon.) পান। ১৯২৮ সালে আগষ্ট মাসে ঢাকায় ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখের উদ্যোগে "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য-সমাজ শহীদুল্লাহ সাহেবকে এক সভায় অভিনন্দন জানান। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল; কিন্তু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অর্বাচীন উক্তি তাঁকে ব্যথিত করে। এই সমাজের জনৈক লেখক একটি প্রবন্ধে ইসলামের

বিধিবিধান দেড় হাজার বছরের পুরোণো, কাজেই বর্জন করলে ক্ষতি নেই—এরকম মন্তব্য করায় অনেকেই ক্ষিপ্ত হন; প্রবন্ধলেখক ও উদ্যোক্তাদের ওপর কিছু কিছু অত্যাচারও চলে। শেষ পর্যন্ত শহীদুল্লাহ সাহেবকে মধ্যস্থ করা হয়। তিনি বললেন, প্রবন্ধলেখক ইসলামের বিরুদ্ধে বলেন নি, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন; তবে আরও একটু সংযত হয়ে বলা উচিত ছিল। তাঁর বিচারে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি—তাঁদের ধারণা হল যে তিনিও ঐ দলে আছেন এবং বাইরে রোযা-নামায করলে কী হবে, ভেতরে ভেতরে হিন্দুভাবাপন্ন। শেষে এই সাহিত্য-সমাজ মাত্রা ঠিক রাখতে পারে নি, ফলে তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করেন।

মুসলিম হলের কতিপয় ছাত্র মিলিত হয়ে "পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজ" গড়ে তোলে। এই সাহিত্য-সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের নানা স্থান থেকে পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। এই সাহিত্য-সমাজের অনেকগুলি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হওয়ায় 'পূর্ববঙ্গ সাহিত্যসমাজ', এক সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মোহিতলাল মজুমদার তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে অধ্যক্ষনির্বাচন যোগ্য লোককে করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

ঢাকায় আসার আগে তিনি "আঙ্গুর" নামে এক শিশুপত্রিকা বের করেছিলেন। এই পত্রিকার আয়ু ছিল মাত্র এক বছরের। ঢাকায় এসে তিনি ১৯২২ সালে "Peace" নামে এক ধর্মমূলক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকায় ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ থাকত। "বঙ্গভূমি" পত্রিকা বাংলাবিভাগের অধ্যক্ষ হবার পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন "তকবীর" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলি স্বল্পায়ু হলেও দেশের শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কেননা এই সব পত্রিকায় তাঁর অনেক মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যে তিনি সুনীতির

প্রচারক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাগের উদ্যোগে 'সুনীতি-সঙ্ঘ' স্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য ও সমাজে অশ্লীলতা দূর করা, সিনেমা দেখা, যৌন-উপন্যাস পাঠ ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা। শহীদুল্লাহ সাহেব এই সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। সমাজ ও সাহিত্যে যা কিছু ক্ষতিসাধনে তৎপব তার মূলোচ্ছেদ করা শহীদুল্লাহ সাহেব ব্রতরূপে গ্রহণ কবেছিলেন। এজন্যে মানসিক সাযুজ্য "সুনীতি সঙ্ঘের" সঙ্গে অনুভব করেছিলেন।

ছয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ তিবিশ বছবেব অধিককাল বাংলা বিভাগে শহীদুল্লাহ সাহেব অধ্যাপনা করেছেন। একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদের উজ্জ্বল মর্যাদা তাঁব প্রাপ্য। ছাত্রদেব সঙ্গে তিনি সহপাঠীর মতই মিশতেন। মুখস্থ কবে পরীক্ষায় পাশমার্ক পাওয়া এবং প্রতিযোগিতায় লটারীর মতন ববাতের জোবে জয়লাভ করাব যে শিক্ষাদর্শ, তিনি শিক্ষকহিসেবে তা ঘৃণা করেছেন। শিক্ষার্থীব মনে জ্ঞানবিদ্যার অনির্বাণ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা শিক্ষকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাব আদর্শ তাই হওয়া উচিত। অধ্যাপনা-জীবনে তিনি ছাত্রদের জ্ঞান-প্রদীপের সলতে উসকে দিতেন যাতে তারা জীবনশিল্পী হতে পারে। তাঁব অনেক ছাত্র উত্তবজীবনে কবি সাহিত্যিকরূপে খ্যাতনামা হয়েছেন। তাঁব শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং ছাত্রদের কেমন করে আপন কবে নিতেন সেই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁব ছাত্র অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ বলেছেন, "বঙ্গভাষাব এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হয়ে ভাষাতত্ত্বেব গভীব অরণ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছি।...তাঁর সরস অধ্যাপনা ভালোও লাগছে। কিন্তু ডঃ সুনীতিকুমারের লিখিত বাংলা ভাষাতত্ত্ববিষয়ক দু'খণ্ডের "Origin and Development of Bengali Language" কি কবে আয়ত্ত কবব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। বই নেই। কোন বন্ধু-বান্ধবেব কাছেও না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বসে এত বড় বই নোট করে আয়ত্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। নিরুপায় হয়ে এক সকালে হাজির হলুম ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র আবাসে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে। আমার উৎকণ্ঠার কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করলেন না। বললেন, আমার ব্যক্তিগত বই কাউকেও আমি দিই না। তোমাকে দিলুম। কাজ হলে ফেরৎ দিয়ে যেও। নষ্ট করো না।···বাঙলা দেশ, বাঙালী জাতিকে তিনি যে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তা টের পেতাম মাঝে মাঝে

অধ্যাপনার সময় তাঁর আবেগ বিচ্ছুরণের সময়। OBDL-এর যে জায়গায় ডক্টর সুনীতিকুমার বিজয় সিংহকে গুজরাটবাসী বলে বর্ণনা করেছেন, সে জায়গায় এসে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। বললেন, সুনীতিকুমার বাঙালীর ঐতিহ্যের অবমাননা করেছেন ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে। আসলে বিজয়সিংহ আমাদের সে শৌর্যময় যুগের বাঙালী যিনি 'হেলায় লঙ্কা জয়' করেছিলেন। যুক্তি-তর্কনির্ভর তাঁর সে মতামত আচার্য সুনীতিকুমার সশ্রদ্ধভাবে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সগৌরবে তিনি তা আমাদের দেখাতেন। বাঙালা দেশের শৌর্যময় অতীতের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করত তাঁর প্রতি। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়াবার সময় তিনি নিখুঁত যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতেন পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ আর এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কিভাবে অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আসতে পারে। তাঁর বৃহত্তর মানবপ্রীতি উচ্ছ্বসিত আবেগে আত্মপ্রকাশ করত তখন।" (আমার চোখে ডক্টর শহীদুল্লাহ) তিনি ছাত্রদের Friend, philosopher and guide ছিলেন। প্রকৃত শিক্ষক তিনিই যিনি প্রতিটি ছাত্রের মন ও রুচি বুঝতে পারেন। তিনি প্রতিটি ছাত্রের মনের খাতা পড়তে পারতেন, যাকে দিয়ে যে কাজ হতে পারে তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করতেন। পরবর্তী জীবনে গুরুর নির্দেশিত পথে তাঁর ছাত্ররা অনেকেই কৃতী হয়েছেন, একথা কারুর অবিদিত নেই।

যে কাজ করার জন্য অর্থাৎ লোকগাথা, লৌকিক ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহ করার বিষয়ে তিনি বারবার নানাস্থলে নানাভাবে বলেছেন সেই কাজ করার জন্য ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে দিতেন। অধুনা লোক-সংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ছাত্র ছিলেন। প্রধানত তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন— শহীদুল্লাহ সাহেব আর পাঁচজন অধ্যাপকদের মত নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে সংগ্রহের কাজও করতেন। এ সম্পর্কে ডক্টর ভট্টাচার্য "বাংলার লোক-সাহিত্য" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়

(১৯৫৪) বলেছেন, "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মত লোক-সাহিত্যপ্রেমিক ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। ১৯৩৮ সনে ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ শহরে পূর্ব-ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনীর…সভাপতিরূপে লোক-সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে তিনি যে একটি সুচিন্তিত মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা সমসাময়িক প্রায় সকল পত্রিকাতেই আনুপূর্বিক প্রকাশিত হইয়াছিল—বহু পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যেও ইহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার লোক-সাহিত্য-প্রীতি কেবলমাত্র বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; তিনি অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব বাংলা বিভাগ হইতে একটি লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ-সমিতি গঠন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য অর্থসাহায্যের উপর নির্ভব করিয়াই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতির ও আমি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি।…আমিও সমিতির পক্ষ হইতে আমার অবসর সময় এই সংগ্রহের কার্যে নিয়োগ করি এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাই।" লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করা তাঁর একটি প্রধান বাতিকে পরিণত হয়েছিল, কেননা লোকগাথার মধ্যেই বাঙালীর প্রকৃত প্রাণের পরশ পাওয়া যায়। "বাংলা সাহিত্যের কথার" মধ্যে তাঁর সংগৃহীত ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অর্থকৃচ্ছ্রতা তাঁকে কাবু করতে পারে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ কম ছিল বলে তিনি স্বয়ং অবিভক্ত বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক ও অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকাবের সঙ্গে দেখা করে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁরা প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন কিন্তু নানাবিধ কারণে অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নি। ছাত্রগবেষকদের গ্রন্থ রচনার কাজে তিনি তথ্য ও নির্দেশ ইত্যাদি দিয়ে প্রচুরভাবে সহায়তা করেছেন এবং এই সহায়তাকে তিনি শিক্ষকের কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁর ছাত্ররাও গুরুঋণ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। "বাংলা মঙ্গল-

কাব্যের ইতিহাস" গ্রন্থে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সেই ঋণের কথা স্মরণ করেছেন এইভাবে, "এই গ্রন্থ রচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহোদয় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের নিকট হইতে যথেষ্ট উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। আমার এই পুস্তক রচনায় যদি কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মূলে তাঁহাদেরই নিকট হইতে লব্ধ শিক্ষার কথা চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।" এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বহু তরুণ গবেষকদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের উত্তর দিয়ে থাকেন। অনেক গবেষক তাঁকে বই উৎসর্গ করে শ্রদ্ধা ও ঋণের কথা স্মরণ করেন।

তাঁর জীবনের আশী বছর (১৯৬৫, ১০ জুলাই) পূর্ণ হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্য-পত্রিকার' ১৩৭২ বর্ষা সংখ্যা তাঁর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সংবর্ধনা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে ইতিহাস সাল অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

॥ অধ্যাপনা ॥

১৯২১ ২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক (লেকচারাব)।

১৯২২-২৪ আইন বিভাগে খণ্ডকাল অধ্যাপক।

১৯২৬-২৮ বিদেশে অধ্যয়নের জন্য অবস্থান।

১৯২৮-৩৪ অধ্যাপক, সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ।

১৯৩৪-৩৫ অস্থায়ী অধ্যক্ষ ও রীডার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ।

১৯৩৫-৩৭ অধ্যাপক সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ।

১৯৩৭-৪৪ অধ্যক্ষ ও রীডার, বাংলা বিভাগ।
[অবসরগ্রহণ ৩০শে জুন, ১৯৪৪]।

১৯৪৮-৫২ অতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

১৯৫২-৫৪ অধ্যক্ষ ও প্রোফেসর, বাংলা বিভাগ।

[অবসরগ্রহণ ১৫-১১-৫৪]।

১৯৫৩-৫৫ ফরাসী ভাষার খণ্ডকাল অধ্যাপক।

[International Relation Dept-এ ফরাসীভাষায় Part-time Lecturer। ১৯৫৫, ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করেন।]

॥ অন্যান্য পদ ॥

১৯২১-২৬ } হাউস টিউটব, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল

১৯২৮-৪০ } অস্থায়ী প্রভোস্ট [১৯৩২-৩৩, ১৯৩৭]।

১৯৪০-৪৪ প্রভোস্ট, ফজলুল হক মুসলিম হল।

১২-১০-১৯৬৩ আজীবন সদস্য, ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়ন।

১৯২২-২৪ সদস্য, ফ্যাকালটি অফ আর্টস এবং 'ল'

[নির্বাচিত বা মনোনীত]

১৯২৮-৩৬ } সদস্য, ফ্যাকালটি অফ আর্টস

১৯৩৭-৪৪ } [নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকাব বলে]।

১৯৫২-৫৩ }

১৯৫৩-৫৪ ডীন, ফ্যাকালটি অফ আর্টস।

১৯২১-২৪, ১৯৩০-৪৪, ১৯৫২-৫৪, ১৯৬৩

সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিল

[নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকাব বলে]।

১৯৩০, ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৪, ১৯৪০-৪৪, ১৯৫৪ সদস্য, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল

[নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকাব বলে]।

১৯৩০-১৯৩৩, ১৯৩৭-৪৪, ১৯৫১-৫৪, ১৯৫৭-৫৮

—সদস্য, য়ুনিভার্সিটি কোর্ট

[মনোনীত বা পদাধিকার বলে]

জুন ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসব গ্রহণ কবে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৯৪৪-৪৮)। যখন তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ হন তখন কলেজেব আর্থিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় এবং নানাপ্রকাব দলাদলিতে কলেজ প্রায় উঠে যাবার পর্যায়ে এসেছিল। তিনি শক্ত হাতে হাল ধরলেন— অচিরেই কলেজটি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পেল। এই কলেজেব অধ্যক্ষ থাকাকালে দেশ

ভাগ হয়। দেশ-বিভাগের ফলে ছাত্র-সংখ্যা অনেক কমে যায়। কলেজের আর্থিক অসুবিধা দেখা দেয়। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় সঙ্কট কেটে যায়। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবার আমন্ত্রণ আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নভেম্বর ১৯৫৪ পর্যন্ত বাংলা বিভাগের অধ্যাপনা ও অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৫৪ সালে রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। বাংলা বিভাগটি চালু করা ও পাঠ্যসূচী তৈরী করার জন্য আবার তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগেব অধ্যক্ষ ও ডীন অফ ফ্যাকালটি অফ আর্টস নিযুক্ত হন (১৯৫৫, ১লা ডিসেম্বর) । বছব তিনেক পর (১৯৫৮) তিনি অবসর গ্রহণ করে করাচীতে এক বছর উর্দু উন্নয়ন-বোর্ডের সম্পাদক ছিলেন এবং উর্দু অভিধান সম্পাদনা করেন (১৯৫৯-৬০)। তারপর ১৯৬০ সালের এপ্রিলে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় একটি আদর্শ অভিধান সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন। অভিধান সম্পাদনার কাজ শেষ করে (১৯৬০-৬৪) বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ইসলামী বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদকরূপে কিছুকাল কাজ করেন (১৯৬১-৬৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করলেও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ছাড়েন নি। ১৯৬৭, ১লা এপ্রিল থেকে তাঁকে আমরণকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus Professor-এর পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সাত

কোনরূপ সুখ্যাতির প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না, খ্যাতি তাঁর কাছে নিজে এসে ধরা দিয়েছে। পূর্ব-বাঙলায় তরুণ গবেষক, ছাত্র, সাহিত্য-রসিক, সংস্কৃতিকামী জনগণের পরমবন্ধু, প্রাজ্ঞ নির্দেশকরূপে ভাষা ও সাহিত্যের আচার্যের আসনে তিনি পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত। তিনি "এসিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তানে"র স্থাপক সদস্য। ঐ প্রতিষ্ঠানেব বার তিনেক সভাপতিও হয়েছিলেন। কিছুকাল আদমজী সাহিত্য-পুরস্কারের প্রধান বিচাবক ছিলেন (১৯৬১-৬৫)। এখন (১৯৬৩ থেকে) দাউদ সাহিত্য-পুবস্কারের প্রধান বিচারক এবং এলায়েন্স ফ্রান্স, পূর্বাঞ্চল শাখা "ইকবাল একাডেমি"র সভাপতি আছেন। এ ছাড়া বহু সরকাবী বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। ১৯৫৮, ২৩শে মার্চ মাসে পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র-দিবসে তিনি সরকার কর্তৃক বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক "Pride of Performance" পদক ও দশ হাজার টাকা পুরস্কার পান। এই সম্মান পূর্ব-বাঙলার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম পান। দেশবাসী বিভিন্ন সময়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও মনীষাব স্বীকৃতি-স্বরূপ একাধিকবার তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে নিজেরা গৌরবান্বিত হয়েছেন। ১৯৬৬, ১০ই জুলাই "এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান" তাঁকে সংবর্ধনা জানান এবং ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকেব সম্পাদনায় একটি অভিনন্দন-গ্রন্থ 'Shahidullah Felicitation Volume' প্রকাশ কবেন। তাঁর একাশী বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চলিক শাখার সদস্যবৃন্দ তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন (৩০শে মার্চ ১৯৬৭ : ১৬ই চৈত্র ১৩৭৩, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৪॥)। তাঁকে প্রদত্ত মানপত্রে তাঁর বিভিন্ন দিকের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়। মানপত্রের অনুলিপি নীচে দেওয়া গেল—

ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র
অশীতি-উত্তর জীবন-উৎসব উপলক্ষে
মানপত্র

হে জ্ঞানব্রতিন্‌,

জীবন-প্রভাতে আপনি জ্ঞান-আহরণকেই জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। জীবন-সায়াহ্নেও আপনি অনলস উদ্যমে জ্ঞান গ্রহণ ও দান ক'রে চলেছেন। আপনার এ নিষ্ঠায় আমরা অনুপ্রাণিত।

হে গুণী,

বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার নিরন্তর বিচরণ, শিক্ষা-বিস্তারে আপনার আগ্রহ, আপনার নিরলস কর্মানুরাগ, সমাজ-হিতৈষণা, ধর্মবুদ্ধি আর এই প্রাচীন দেহে আপনার উদ্যমশীল তরুণ মন আমাদের মুগ্ধ করেছে।

হে সাধক,

নব নব তথ্যের আবিষ্কারে, বিচিত্র তত্ত্বের উদ্ভাবনে এবং ইতিহাসের জটিল গ্রন্থিমোচনে আপনার অনুসন্ধিৎসা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, আলোকিত করেছে বাঙলার ইতিহাসের আঁধার গহ্বর। আপনার ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, আপনার অভিধান ও বিশ্বকোষ আমাদের জাতীয় সম্পদ।

হে বরেণ্য জ্ঞানী,

আপনার বিদ্যাবত্তা আমাদের বিস্ময়, আপনার সাধনাসুষম জীবন আমাদের প্রেরণার উৎস, আপনার সমাজকল্যাণ-বোধ আমাদের কাম্য।

হে বিদগ্ধ,

বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে আপনি জাতির প্রতিভূ, —জাতীয় গর্ব ও গৌরবের অবলম্বন, দেশের জ্ঞানপিপাসু

জনচিত্তে আপনি প্রমূর্ত ঐতিহ্য। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

হে দেশপ্রিয়,

অসূয়ামুক্ত আপনার হৃদয়, গ্রহণশীল আপনাব চিত্ত, সহনশীলতা আপনার সংস্কৃতি, সুরুচি আপনাব সাধ্য, কল্যাণ আপনাব কাম্য, মনুষ্যত্বই আপনাব লক্ষ্য। আপনাব ব্যক্তিত্ব-প্রভায় আমরা প্রীত।

হে সার্থককাম পুরুষ,

আপনার অশীতি-উত্তব জীবন-উৎসবেব আয়োজন কবে আমবা আনন্দিত। আপনাকে আমাদেব কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সালাম জানাই, নিবেদন কবি শ্রদ্ধা, কামনা কবি আপনার সুদীর্ঘ আয়ু।

গুণমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ

পাকিস্তান লেখক-সংঘের পূর্বাঞ্চলিক শাখার সদস্যবৃন্দ

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কাজী আনোয়ারুল হক। তিনি শ্রদ্ধানিবেদন প্রসংগে বলেন, "পাকিস্তান লেখক-সংঘের ঢাকা-শাখা দেশবরেণ্য ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ্‌র একাশীতিতম জন্মবার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে, এই শুভ সংবাদ নানা কারণে আমাব কাছে তাৎপর্যময়। প্রথমতঃ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি বাংলা ভাষার সেবায় আজীবন পরম ভক্তের মত আপনাকে নিবেদন করেছেন। অধিকন্তু, তিনি পাক-ভারত উপ-মহাদেশে একজন স্বীকৃত উঁচুদরের ভাষাবিজ্ঞানী, নানা ভাষায় তিনি সমান পারদর্শী এবং বহু জীবিত ও মৃত ভাষায় স্বচ্ছন্দবিহারী। কিন্তু, দুনিয়ার নানা দেশের বিচিত্র ভাষায় সহজে বিচরণ করতে সমর্থ হলেও, আমার তো মনে হয় বাংলা ভাষার আবহাওয়ায় বিচরণ করতে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, কেননা এটিই তাঁর মাতৃভাষা।" এই উপলক্ষ্যে একটি

সংবর্ধনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তাঁকে এক কপি অর্পণ করা হয়। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ। এই সংবর্ধনা-গ্রন্থের প্রথম ভাগে শহীদুল্লাহ সাহেবের নির্বাচিত রচনাবলী সংকলিত হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের রচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি তাঁর সম্পর্কে একটি আকরগ্রন্থ।

১৯২০ সালে ছাত্রদেব উদ্দেশ্যে প্রবীণ শিক্ষাবিদেব অভিজ্ঞতা থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সকল কর্তব্য তিনি নির্দেশ করেছিলেন সেগুলি আজও পালিত হয় নি—যদি হ'ত তাহলে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ আঞ্চলিক শব্দ মৌখিক চলিত ও লৈখিক একটি আদর্শ অভিধান পাওয়া যেত, যা তাঁকে এই বয়সে কষ্ট করে সম্পাদনা করতে হ'ত না। মাতৃভাষার প্রতি ছাত্রসমাজের গঠনমূলক কর্মপন্থা যা তিনি নির্দেশ করেছিলেন সেগুলি হল এই—

১. আমাদের চাই The New Oxford Dictionary-র ন্যায় একটি ঐতিহাসিক প্রণালীরূপে সজ্জিত অভিধান, ইহার জন্য সমস্ত প্রাচীন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথির শব্দসূচি করিতে হইবে। The New Oxford Dictionary-র জন্য বহু সহস্র স্বেচ্ছা-শব্দ-সংগ্রাহক হইয়াছিল, আমাদের জন্য কি একজন স্বেচ্ছা-সাহিত্যসেবক পাওয়া যাইবে না?

২. ভাষাতত্ত্বে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান প্রাদেশিক বিভাষার সাহায্যে হইতে পারে।...The English Dialect Dictionary প্রায় তিন শত স্বেচ্ছা-সাহিত্য-সেবকের যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের প্রাদেশিক বিভাষা সংগ্রহের জন্য আমরা কি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটি করিয়া উদ্যোগী ছাত্র সাহিত্য-সেবক পাইব না?

৩. বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে কিরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। ছাত্রগণ ব্যতীত কে এই আপাত-নীরস কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে?

৪. বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস একটি বাঞ্ছিত পদার্থ। ইতিহাসের উপকরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপরূপে প্রাচীন মন্দির-মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তিরূপে কিংবা লোক-মুখে ছড়া বা কিংবদন্তীরূপে ছড়ানো রহিয়াছে। ইতিহাসের এই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের ভার ছাত্রগণ লইলে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা জাতীয় ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি।

৫. ঠাকুরমা ও দিদিমার মুখে মুখে এখনও কত উপকথা, হিঁয়ালি, মেয়েলি ব্রতকথা ও ছড়া রহিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা শক্তিতে আশঙ্কা হয় শীঘ্রই এ সমস্ত লোপ পাইবে, অথচ এই সমস্ত নৃতত্ত্বের আলোচনার একটি বিশেষ সহায়। ছাত্রগণ ব্যতীত কে এই কাজ করিবে ?

৬. বহু পুঁথি বাঙ্গালার নিভৃত কোণে গুপ্ত রহিয়াছে। বাহিরের লোকের পক্ষে তাহার দর্শন পাওয়া দূরে থাক, সন্ধান পাওয়াই সুদুরূহ। ছাত্রগণ নিজেদের গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে অনুসন্ধান করিয়া অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে।

তিনি শুধু কর্তব্যগুলি নির্দেশ করে ক্ষান্ত হন নি, এই বৃদ্ধ বয়সে তরুণের উন্মাদনা নিয়ে প্রায় শ পাঁচেক শব্দ সংগ্রাহকের প্রচেষ্টায় The New Oxford Dictionary ও English Dialect Dictionary-র অনুকরণে "পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" রচনার কাজ শেষ করেছেন। সম্প্রতি (১৯৬৪) এই অভিধানের প্রথম অংশ ('অ' থেকে আনতুর পর্যন্ত শব্দাবলী) প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের অনেক দিনের একটি অভাব পূর্ণ হবে এবং তিনি অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হবেন।

কর্ম থেকে অবসর তিনি কোনদিন নেন নি— সারাজীবন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন, বহুজনহিতায় নিজেকে কর্মচঞ্চল রেখেছেন। কাজের ডাক এলে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও করাচী ছুটেছেন। উর্দু অভিধান সম্পাদনার জন্য তিনি বয়োধর্ম উপেক্ষা করে পুত্রকন্যা, হিতৈষীদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ১৯৫৯, এপ্রিল মাসে করাচী রওনা

হয়েছেন—সেখানে পাকা এক বছর থেকে উর্দু অভিধানের 'বে' অক্ষর পর্যন্ত প্রায় হাজার দেড়েক আর্য-অনার্য শব্দের সঠিক ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন।

বিদ্বৎসমাজের বিভিন্ন সম্মেলনে যেমন, নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন, নিখিল ভারত ইতিহাস সম্মেলন, নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন, আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, আন্তর্জাতিক ইসলামিক ভাষণ সম্মেলন, আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. সেমিনার ইত্যাদিতে যোগদান করেছেন, তেমনি সমান উৎসাহে যুব ও তরুণ সম্প্রদায়ের আয়োজিত অসংখ্য সভা-সমিতি-সম্মেলনে যোগদান করেছেন। যুবক তরুণদের আয়োজিত সম্মেলনে তাঁর যোগ দিতে বেশী আনন্দ। তিনি কোন একটি সম্মেলনে তাঁর আনন্দের কারণ ব্যক্ত করেছিলেন, "তোমরা আমায় ডেকেছ; আমি তোমাদের ডাক শুনে এসেছি। এই যে চোখ-জুড়ানো সবুজের মেলা, সেই মেলায় মিলেছি তোমাদেরই কল্যাণে। তোমাদিগকে ধন্যবাদ।...বুড়ো তার পাকা মাথায় লাভ-লোকসান বুঝে তবে কাজ করে। যুবক তার কাঁচা মাথায় এত গোল পাকায় না। সে যা ভাল বুঝবে, বড় বুঝবে, সত্য বুঝবে, সুন্দর বুঝবে, তার জন্য সে যুঝবে। লাভক্ষতির কথা সেখানে নেই। বুড়োর মরণে ভয়; পুরানো জেলের কয়েদী, তার জেল ছাড়তেই যে কান্না পায়। যুবক তার মরণেও আনন্দ। আজ সময় এসেছে, নতুনেরা আগে চলবে, পুরানোরা তাদের লেজুড় ধরবে। কাল যে এখন উল্টো। কিন্তু কাঁচা চুলেও অনেক ঝুনো বুড়ো আছে আর পাকা চুলেও অনেক তাজা যুবক আছে। সেই ধন্য যে যৌবনে খাঁটি যুবক।" (নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক-সম্মেলন, ১৯২৮)। বিরাশী বছরের পাকা চুলে তিনি আজও তরুণদের মধ্যে তরুণতর যুবক। তরুণদের আহ্বানে, তরুণদের আন্দোলনে তাঁর সমর্থন রয়েছে। ভাষা-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসের বিষয় হয়েছে। ৭৩ বৎসর পদার্পণ উপলক্ষ্যে পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা-সভার মানপত্রে ভাষা-আন্দোলনে তাঁর ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা

হয়েছে, "স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন আতঙ্কিত করে তুলেছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহলের কূট চক্রান্তে। মাতৃভাষা বাংলাভাষার বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের সামগ্রিক জীবনবোধ দ্বিধা-জটিল করে তুলতে চেয়েছিল। আরবী হরফে বাংলা ভাষার প্রবর্তন তাদের অন্যতম কৌশল। তোমার সে সময়কার বলিষ্ঠ ভূমিকা জাতিব ইতিহাসে মৃত্যুহীন স্বাক্ষর। ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তিতথ্যে তুমি প্রমাণ কবেছিলে আরবী হরফে বাংলাভাষা প্রবর্তনের অযৌক্তিকতা। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠেছিল যাদের সংকল্প এবং অনুপ্রেরণায়, তাদের তুমি আশীর্বাদ করেছিলে অকুতোভয়ে আত্মিক সমর্থন দিয়ে। তোমার সে ভূমিকা আমাদেব এক মূল্যবান ঐতিহ্য।"

বিগত অর্ধশতাব্দী ধবে শহীদুল্লাহ সাহেব বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেসব ভাষণ দিয়েছেন তাব কিছু অংশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে; ভাষণ ছাড়া তাঁব অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে পড়ে আছে তা দিয়ে অনায়াসেই আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ বেরুতে পারে। কিন্তু এদিকে তিনি বিশেষ যত্ন নেন নি— গ্রন্থাকারে বের করতে হলে কিছু ঝক্কি পোহাতে হয়, সেজন্যে সময়ের দরকার। এই সময়টুকুও তিনি দিতে চান নি— মনে হয় প্রবন্ধ সংকলনের জন্য যে সময় ব্যয় করবেন সেই সময়ে তিনি আরও কিছু প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারেন কিংবা নতুন কিছু চিন্তা করতে পারেন। সেজন্যে তাঁর গুণগ্রাহীদের এবিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে। তাঁর বিরাট মহান কর্মজীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে একজীবনের সাধনায় তিনি বহু জীবনের অসাধ্য সাধন করেছেন। একটি মানুষ কি করে এক জীবনে এত বিষয়ের এত বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে সেই অবাক বিস্ময়ের আর এক নাম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

আট

দীর্ঘজীবনে শহীদুল্লাহ সাহেব কদাচিৎ পীড়িত হয়েছেন— বরাবর তিনি কর্মনিষ্ঠ জীবনযাপন করেছেন। শক্ত সমর্থ সবল দেহ তাঁব প্রথম থেকেই ছিল— শরীবেব প্রতি পৃথক যত্ন না নিলেও রুটিনবাঁধা জীবন যাপন, ধর্মীয় নিয়মকানুন তিনি কঠোবভাবে পালন কবতেন। বয়সের ভারে ইদানীং কিঞ্চিৎ অশক্ত হয়ে পড়লেও লেখাপড়া, নামায-রোযা, সভা-সমিতিতে যোগদানেব উৎসাহ তাঁর কমতি ছিল না। ১৯৬৩ সাল থেকে তাঁর শরীর অসুস্থ হতে আরম্ভ করে। ১৯৬৪ সালে রোযার শেষে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন এবং প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ব্যাপী হিক্কায় কষ্ট পান। কিছুদিন পব বাংলা একাডেমীতে ইসলামী বিশ্বকোষ আঞ্চলিক বাংলা ভাষাব অভিধান সম্পাদনার কাজ কবার সময় তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বেরোয়— বেশ কিছুদিন তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়। ১৯৬৫ সালের রমযান মাসে তাঁর বুকের অসুখ দেখা দেয় এবং জীবন-সংশয় হয়ে ওঠে। এই অসুখ তাঁকে শয্যাশায়ী করে ফেললেও তিনি কাবু হন নি। সুস্থ হয়ে তিনি আগের মতই কর্মক্ষম ছিলেন কিন্তু ১৯৬৭, ২৭শে ডিসেম্বরে 'সেরিব্রল থ্রম্বসিস' আক্রমণে পঙ্গু হয়ে পড়েন। সেদিন ছিল ২৪শে রমযান— নিয়মিত বোযা রেখেছেন। বাড়ীর নিকটস্থ চকবাজারেব বড় মসজিদে নামায পড়তে গিয়েছেন; নামাযেব রুকুতে দাঁড়াতে গিয়েই প্রায় তিনটের সময অসুস্থবোধ করেন। সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন কিন্তু জ্ঞান হারান নি, মগরিবের আযান শুনে রোযা একতাব (ভঙ্গ) করেন। এবছর শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁকে তিনটি রোযা ভাঙতে হয়েছিল এবং ২০শে রমযান থেকে তিনি ইতিকাফ্ পালন করে এসেছেন। ঐ দিন ইসলামিক একাডেমীতে 'নযুল-ই-কুবআনে'র চতুর্দশ শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁর।

শবীর অসুস্থ হওয়াতে তাঁকে বাড়ীতে আনা হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে

সাতটায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর দেহের ডান পাশ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অবশ হয়ে গেছে। ভালভাবে কথা বলতে পারেন না—হঠাৎ কাউকে চিনতে পারেন না। ডাক্তার নুরুল ইসলামের (Joint Director of the Institute of Post Graduate Medicine) চিকিৎসাধীনে ও তত্ত্বাবধানে ৯ নম্বর নিউ কেবিনে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছেন। 'দৈনিক পাকিস্তান' সংবাদপত্রের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সংখ্যায় জনৈক সাংবাদিক '৯ নং নিউ কেবিন' শীর্ষক নিবন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের শারীরিক অবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেন। এখানে সেই বিবরণের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল—

: কেবিনে ঢোকার আগে অনেকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বিকেল বেলা। এসময় দর্শনার্থীর ভীড় অত্যন্ত বেশী। কিন্তু চিকিৎসকের নির্দেশে দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। লোকজন দেখলেই তিনি কথা বলার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। অথচ কথা বলতে পারেন না তেমন। বেশ কষ্ট হয়। আধো আধো অস্ফুটভাবে যা বলেন তা অতি নিকটজন ছাড়া বোঝা মুশকিল।...

তিনি ইজিচেয়ারের উপর শুয়ে রয়েছেন। পরণে লুংগী সাদা পাঞ্জাবী। বাঁ হাতের কব্জিতে তাঁর প্রিয় ঘড়িটি বাঁধা। তাঁর ছেলে জনাব রাজীয়ুল্লাহ পাশে রয়েছেন।

ঘরে ঢোকার পর রাজীয়ুল্লাহ তাঁকে বল্লেন, বাবা ওঁরা পত্রিকা অফিস থেকে তোমাকে দেখতে এসেছেন।

প্রথমে অনেকক্ষণ শিশুর মতো তাকিয়ে রইলেন। অনেক পরে অস্ফুটে বল্লেন, চিনি।

তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন—এঁরা কে ?

শুনলাম—পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর খানিকটা স্মৃতিবিলুপ্তি ঘটেছে। অতি আপনজন এমনকি ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীকেও চট্ করে চিনতে পারেন না। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ও পরিচয় দেওয়ার পর চিনতে পারেন। আমরা থাকতেই এর প্রমাণ পেলাম। অতি পরিচিত এক ভদ্র লোককে চিনতে তিনি যেন আপ্রাণ স্মৃতিমন্থন করছিলেন।

ডাক্তারের নির্দেশ রয়েছে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে আলাপ করে স্মৃতিকে সজীব করে তোলার চেষ্টা করার জন্যে। তাই করা হয়। রাজীয়ুল্লাহ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন— বাবা এখন কটা বাজে ?

তিনি বেশ কিছু পর প্রশ্নটি বুঝতে পারলেন। ঘড়ির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠে বল্লেন, সাড়ে নটা।

ঘড়িতে তখন বিকেল সোয়া পাঁচটা। রাজীয়ুল্লাহ সাহেব বল্লেন, বাবা ভালো করে দেখে বলো।

অনেক পরে তিনি বল্লেন,— সাড়ে ছ'টা।

শুনলাম বই পড়া এবং লেখার কাজ করার জন্যে মাঝে মাঝেই জেদ ধরেন। তখন তাঁর কাছে বই দেওয়া হয়। কিন্তু মিনিট তিনেক চোখ বুলিয়েই হাঁফিয়ে ওঠেন। বলেন,— রেখে দাও। বাঁ হাত দিয়ে লেখার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু তাও কয়েক মিনিটের জন্যে।

গত একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা। কিছু ছাত্র এসে তাঁকে কয়েক গোছা ফুল দিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে তাঁর ঠিক স্মরণ হয় নি। কবি জসীমউদ্দীন এলেন কিছু পর। কথায় কথায় বল্লেন,— স্যার ! আজ তো একুশে ফেব্রুয়ারী। হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো এবং তারপরই সে কি জেদ। বলতে লাগলেন, আমার ব্যাগ দাও। আমি বাংলা একাডেমীতে বক্তৃতা দিতে যাবো।

ডাক্তার বল্লেন, আপনি কি করে যাবেন ?

হুইল-চেয়ার দেখিয়ে তিনি বল্লেন,— আমি ঐ বাক্সে চড়ে যাবো।

অনেক কষ্টে তাঁকে বিরত করা হলো। কিন্তু আবার আবদার। পত্রিকা দাও। আমার লেখা ছাপেনি কেউ ? পত্রিকা এনে দেওয়ার পর নিজের লেখা দেখে তবে তিনি শান্ত হলেন।···

দিনে রাতে ঘুম তাঁর খুবই কম হয়। বিকেলে হুইল-চেয়ারে করে খানিকক্ষণ তাঁকে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঘুরিয়ে আনা হয়। তখন যেন খানিকটা স্বস্তিবোধ করেন। (ফাল্গুন ১২, ১৩৭৪ রবিবার) চিকিৎসকেরা আশা করেন যে ব্যাধি আর প্রসারিত না হলে তিনি কথা বলার ক্ষমতা ও স্মৃতি-শক্তি ফিরে পাবেন এবং কাজকর্মও করতে পারবেন। তাঁদের মতে শহীদুল্লাহ সাহেবের ডান হাতের 'ইনার মাসল' নাকি একটু সজীব হয়েছে। যাঁর কাছে সকল প্রার্থনা পৌঁছয় সেই বিশ্বনিয়ন্তার কাছে আমরাও প্রার্থনা জানাই, তিনি সুস্থ কর্মক্ষম হয়ে শত সহস্র শরতের আয়ু নিয়ে ফিরে আসুন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভুবনখ্যাত পণ্ডিত হলেও পূর্বপাকিস্তানে সর্বশ্রেণীর একান্ত প্রিয়জন। কোনদিন বিদ্যার অভিমান নিয়ে লোকের কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন নি— যার কাছে যেমন হওয়ার দরকার তার কাছে তেমনভাবে নিজেকে রাখতে পারেন। এজন্য পথের মানুষও তাঁকে আত্মীয়ের মত ভালবাসতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ তাঁর জন্মভূমি হলেও পূর্ববঙ্গ তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ। মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা প্রীতিপ্রদ ছিল না। মোহিতলাল প্রকাশ্যেই পূর্ববাঙলার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে কটাক্ষ করতেন। বনফুলকে লিখিত ৯.১০.৪০ তারিখের পত্রে তার প্রমাণ মিলবে। তিনি লিখেছিলেন, "এতদিন এখানে রহিলাম কি বয়স্কদের মধ্যে, কি ছাত্রদের মধ্যে— একটিও সত্যিকার সাহিত্য-রসিক দেখিলাম না। ছাত্ররাও সাহিত্যচর্চার যে কসরৎ করে অথবা রসিক হওয়ার যে 'আপ্রাণ' চেষ্টা করে, তাহা সকল সময়ে ভয়াবহ না হইলেও শোকাবহ।...এমন stark materialist আমি আর কোথাও দেখি নাই।...আমার মনে হয় অতীতের সঙ্গে ইহাদের যোগ বড় অল্প, কোন পাকা বনিয়াদ কোথাও নাই, ধর্মের বাঁধন একটা ছিল, তাহা এক্ষণে ঘুচিয়া যাওয়ায় কোন সংস্কারই এখন আর নাই, তাই সর্ববিষয়ে ইহারা প্রগতিবাদের দোহাই দিয়া অভিমান চরিতার্থ করিতেছে। মনের aristocracy নাই বলিয়া ইহাদের কোন বিষয়ে লজ্জা নাই।" (মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃঃ ১১০-১১১)। শহীদুল্লাহ সাহেব বাঙলা সংস্কৃতিকে পূর্ব-পশ্চিমে খণ্ডিত দৃষ্টিতে বিচার করেন নি— তাঁর কাছে গাঙ্গেয় সংস্কৃতিই যে বঙ্গসংস্কৃতি তা নয়, সংস্কৃতি-গঠনে পূর্ববাঙলার সক্রিয় দান রয়েছে। তাই ভালো জিনিষ উভয় বাঙলারই একান্ত আপন বস্তু। তিনি ঢাকায় চাকরী করতে এসে এদেশেরই

নাগরিক হয়ে যান, ছেলেমেয়েদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এদেশেই করেছেন।

সুখে-দুঃখে আনন্দে-বেদনায় তিনি সব সময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কারুর প্রিয়জন বিয়োগে, কাছে হ'লে বাড়ী গিয়ে, দূরে হলে চিঠি মারফৎ সান্ত্বনা দিয়েছেন। বিবাহোৎসবেও তিনি নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানাতে যান— কোন ধর্মের বিচার নেই, যে তাঁকে ডেকেছে তারই কাছে গিয়েছেন। ধর্ম ও সংস্কৃতি-জীবনে তাঁর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। নানাধর্মের অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা দেন, মিলাদ শরীফে যেমন আগ্রহ হিন্দুদের ধর্মীয় সভায় যোগ দিতে তেমনি সমান উৎসাহ। তাঁব সহযোগী কর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার এত ভাল ছিল যে তাঁর অধীনে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায়— এরকম কথা তাঁব সহকর্মীরাই গল্প করেন। কেননা পণ্ডিতসুলভ উন্নাসিকতা তাঁর নেই— সবার সঙ্গে মিশে যাবার একটা দুর্লভ গুণ তাঁর চরিত্রে আছে। প্রথমতঃ তিনি গুণের আদর করেন, দ্বিতীয়তঃ অন্যের কাজে ওপরওয়ালা হিসেবে অযথা হস্তক্ষেপ করেন না। যিনি যে কাজ করেন তাঁকে তিনি স্বীকৃতি দেন— অপরের কৃতিত্বকে তিনি আত্মসাৎ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিতর্কমূলক কাজ ভোট মারফৎ করতেন না— সকলকে বুঝিয়ে আপোষে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করতেন। বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ থাকা-কালীন অবস্থাতেও তিনি কলেজের কাজ এইভাবেই করতেন। অধস্তনকে মই হিসেবে ব্যবহার করে ওপরে ওঠাব মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না বলে অধ্যাপনা-জীবনে তাঁর কোন উন্নতি হয় নি— তাঁর চেয়ে নিকম পাণ্ডিত্য নিয়ে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। এজন্য তিনি কখনো দুঃখ প্রকাশ করেন নি— নিজের অবস্থাতেই সুখী হয়েছেন।

ছাত্রদের তিনি নিজের পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন। পড়ানই তাঁর কর্তব্য ছিল না, প্রতিটি ছাত্রের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করতেন। তাঁর বাসা "পিয়ারা হাউস"-এ থেকে অনেক ছাত্র পড়াশুনা করেছে। গরীব ছাত্রদের মাইনে দেওয়া, হস্টেলের খরচ চালানো, বইপত্র কিনে দেওয়া তাঁর নিত্যকর্মের অঙ্গ। অনেকেই তাঁকে প্রতারণা করেছে,

কিন্তু তিনি শক্ত হন নি। তাঁর অনেক ছাত্র তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তা জেনেও যদি কেউ বিপদে পড়েছে তাকে উদ্ধাব করতে তিনিই এগিয়েছেন। ছাত্ররা প্রতিষ্ঠা পেলে তিনি সবচেয়ে বেশী খুশী হন। যাদের মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভা রয়েছে তাদের হাত ধরে সাহিত্যের অঙ্গনে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ছাত্রদের লেখা তিনি পড়েন, মনে রাখেন, দেখা-সাক্ষাৎ হলে ছাত্র বলাব আগেই তার লেখার কথা পাড়েন। তা ব'লে ছাত্রদের অন্যায়কে তিনি কোনদিন সমর্থন করেন নি—হস্টেলে কোনরূপ অনাচাব হতে দিতেন না।

লোককে তিনি খাওয়াতে ভালবাসেন। তাঁব বাসা থেকে কোন অতিথি কিংবা ভিখারী অভুক্ত ফিবে যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফেরার পথে মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি কিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিলোনো তাঁর অভ্যাস। এ অভ্যাস চাকবী থেকে অবসর নিয়েও যায় নি। তাঁব বাসায় যাবা স্থান পায় নিজেব ছেলে-মেয়েদের সাথে তাদেব এক পরিবারভুক্ত কবে ভবণ-পোষণ করেন—উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই।

যা করব বলে ঠিক কবেন তা করেই ছাড়েন। ছাত্রজীবনেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত পড়ার অনুমতি না দিলে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন যে তাঁকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হতে হবে। নিজস্ব চেষ্টায় তিনি তাই হতে পেরে-ছিলেন। স্যর আশুতোষের জন্মদিনে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সামনে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন—আশুতোষ ও পণ্ডিতরা বিস্মিত হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে যাঁকে বেদ পড়তে দেওয়া হয় নি অধ্যাপক জীবনে সংস্কৃত অর্নাস ক্লাসে বেদ পড়িয়েছেন। আর একবার ঢাকায় মিশরের আরবী পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে-ছিলেন, সেই ভাষণের বাংলা অনুবাদ করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেন নি—শহীদুল্লাহ সাহেব এগিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রেখে-ছিলেন। কঠোর সংযম ও ধর্মীয় সাধনাব মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কেটেছে। রোযা রাখার কাহিনী আগেই বলেছি। নামায পড়া

জীবনে একবারও কামাই করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় জায়নামায তাঁর ব্যাগে থাকত। এরোপ্লেন বা ট্রেনে যাবার সময়ও তিনি নামায আদায় করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যেমন পেটের প্রয়োজনে দিনে চারবার খাই তেমনি মনের শুদ্ধির প্রয়োজনে পাঁচ বার নামায পড়া দরকার। আধুনিক জড়বাদে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না বলে তিনি ইসলামী নীতি কঠোরভাবে পালন করেন। শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন তিনি মেনে চলেন, নাচ-গান দেখাশোনায় তাঁর প্রবৃত্তি নেই। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুর্তজা বশির ছবি আঁকেন তাও তাঁর পছন্দ নয়। শরীয়তী সাদাসিধে জীবনযাপনের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা—তিনি সেইমত চলেন বলেই তাঁকে সাধকপুরুষ ব'লে মনে হবে। তিনি বলেন "শরীয়ত মুসলমানকে রক্ষার জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন-- 'এই কুরআন এইজন্য তোমার উপর অবতীর্ণ করি নি, যে তুমি হতভাগ্য হয়ে যাবে'।" আর ধর্ম সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা তিনি মেনে চলেন, "আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলি ধর্ম বন্ধন নয়, ইসলাম বন্ধন নয়। ইসলাম পরম মুক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(মুহম্মদ) তাদের ভার আর তাদের গলায় যে গলবন্ধন আছে, তা তাদের থেকে দূর কর'। উদ্দেশ্য বুঝে ধর্মের অনুষ্ঠান পালন মস্তবড় শাসন discipline, তা আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে রক্ষা করে সকল রকম মুক্তির পথে নিয়ে যাবে, কেবল পরলোকে আত্মার মুক্তি নয়, ইহলোকে দেহের মুক্তি ও বুদ্ধির মুক্তি।" এজন্য তাঁর জীবনে সঙ্কীর্ণতা নেই, গোঁড়ামি নেই।

তিনি মনে-প্রাণে একজন স্বদেশী। দেশী জিনিষ ব্যবহার করেন। অসহযোগ-আন্দোলনে স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত ত্যাগ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ছিল কিন্তু সেই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশী জিনিষ ব্যবহার করার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। বিদেশ থেকে ফিরে এসেও খদ্দরের পায়জামা আচকান ব্যবহার করতেন—বাড়ীর সবাইকে খদ্দরের মোটা কাপড় ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়েছিলেন। দেশের টাকা দেশে থাকবে, দেশে যা পাওয়া

যায় তাই কেনা উচিত। পিতার এই স্বদেশীভাব পুত্র সফিয়ুল্লাহ ও তকিয়ুল্লাহ পেয়েছেন। সফিয়ুল্লাহ ছাত্রজীবনে ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাণ্ডা ছিলেন আব তকিয়ুল্লাহ ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে কয়েক বছব জেল খেটেছেন।

বই তাঁর জীবনেব সঙ্গী— তিনি বহস্য কবে নিজের পবিচয দেন 'জ্ঞানানন্দ স্বামী' নামে। যা কিছু আয কবেছেন তাব তিনভাগ বই কেনাব পিছনে খবচ কবেছেন। তিনি লেখাপডাব মানুষ, আগাগোডা বিদ্যাচর্চা নিয়ে কাটিয়েছেন, বিভ্রান্তি ও আত্মভ্রষ্টতাব যুগে বিষয়ান্তবে প্রবেশ কবে স্বধর্মচ্যুত হন নি। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগাব দেখাব মত— দেশ-বিদেশেব গ্রন্থ দ্বাবা সমৃদ্ধ। গ্রন্থপাঠে এমনই মগ্ন থাকেন যে খাওযা-দাওযাব কথা তিনি ভুলে যান। তাঁব কন্যা মহযুযা হক পিতাব উদাসীনতা সম্পর্কে বলেছেন, "একবার সকালে নাস্তা খেয়ে তিনি বাইরে গেলেন, আব দুপুবে খেলেন না। আমি ও মা বাইরেব পানে সমস্ত দিন তাকিয়ে বইলাম। সন্ধ্যাব আগে দেখলাম ইউনিভার্সিটি হতে ধীব পদে বই বগলে বাবা বাড়ীব পানে এগিয়ে আসছেন। আমি এক লাফে তাঁব কাছে দৌডিযে গিযে তাঁব না খাওয়ার কাবণ জিজ্ঞাস' কবতে লাগলাম। তিনি কিছুতেই আমার কথা ঠিকমত বুঝতে পাবছিলেন না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন—সত্যই কি তিনি খান নাই? তিনি জানালেন সমস্ত দিন তিনি ইউনিভার্সিটিব লাইব্রেবীতে ছিলেন। খাওযাব সময় তাঁর ব্যস্ততার অন্ত থাকে না। জীবনে কখনও গোটা কমলা লেবু ছিলে খান নাই। আমি কিংবা মা সামনে দাঁড়িয়ে লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে বিচি ফেলে দিলে হযত দু'চাব কোয়া খেয়ে বলতেন— 'সময় নাই, তোমরা খেয়ে ফেল কিংবা ছোট বাচ্চাদেব দিযে দাও'। মাছের টুকরা পাতে নিয়ে কখনও তিনি মাছ খান নি। বাটীতে রেখেই একটু একটু করে খুঁটে খান।·· তিনি সাবাজীবন অনিয়মের ভিতর খাওয়াদাওয়া করেছেন।· খাওয়াদাওযাব ব্যাপাবে মার সঙ্গে বা চাকরবাকরের সঙ্গে রাগারাগি করেন না। ঠাণ্ডা ভাত-তবকারী হলেও তিনি কাউকে

গরম করে দিতে বলেন না; ঠাণ্ডা জিনিসই খান।" (ঘরোয়া: শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা-গ্রন্থ)। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পড়তে পড়তে কখন যে গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হল দেখলেন কপাট বাইরের থেকে বন্ধ। চেঁচামেচি করার পর দারোয়ান গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করে। তিনি তাঁব গ্রন্থাগার থেকে কাউকে বই ধার দেন না। অনেকেই বই নিয়ে গেছেন ফেরৎ দেন নি, অনেক মূল্যবান বই এভাবে তাঁর খোয়া গেছে। বই ধার চাইতে গেলে তিনি বলেন—

লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা।
যদি সা পুনরায়াতি ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দিতা॥

অধ্যাপনাতেই তিনি আনন্দ পান বেশী, কেননা তা করতে গিয়ে লেখাপড়ার চর্চা হয় এবং ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে ভাবেরও আদান-প্রদান হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিয়েও যখন আহ্বান এসেছে তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়েছেন। পড়াশুনার সুবিধার জন্য বেশী আয়ের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। অধ্যাপনার চাকরীতে অবসর পাওয়া যায়, ছুটি থাকে। তিনি বলেন— বেশী টাকাব চাকরীর চেয়ে কম আয়ের চাকবী ঢের ভালো যদি তাতে বেশী অবসর ও ছুটি থাকে। জ্ঞানচর্চা তাঁর শরীরের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে। সৈয়দ আলী আহ্সানের কথায় বলা যেতে পারে 'জ্ঞান যেন তাঁর অস্তিত্বে আকাশ এবং কবিতা। দিগন্তের ইচ্ছার মতো যেন তা বিপুল প্রশান্তির জয়ের অনিবার্যতা।' কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর জ্ঞানচর্চার জন্য আমরা তাঁকে অখণ্ড অবসর খুঁজে দিতে পারি নি।

শহীদুল্লাহ সাহেব পাণ্ডিত্যের তুলনায় প্রাপ্য সম্মান পান নি। সেজন্যে কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই — দেশ তাঁকে কিছু দিক বা না দিক তিনি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতে গিয়ে দেশের সেবা করেছেন, মানুষকে ভালবেসেছেন। আরবী হরফে বাংলা লেখা চালু করার জন্য সরকার তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু প্রলোভনে তিনি

মস্তক বিক্রয় করেন নি, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি। সেজন্য তাঁকে অপদস্থ করেছে, লাঞ্ছিত করেছে এমন কি চরিত্রহননের অপকৌশল অর্থাৎ 'ভারতীয় গুপ্তচর' বলেছে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠার দৃঢ়তার কাছে সব কিছু পরাজিত হয়েছে। লেসিং বলেছিলেন, ভগবানের এক হাতে আছে সত্য আর এক হাতে আছে সত্যের অনুসন্ধান—এ দুটির মধ্যে তাঁকে যদি কোন একটি বেছে নিতে বলা হয় তাহলে তিনি সত্যানুসন্ধানের বর চাইবেন। নিরন্তর জিজ্ঞাসার ধুনি জ্বালিয়ে যে সারাজীবন চলতে পারে সেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো প্রগতিশীল। শহীদুল্লাহ সাহেবের জীবন ও সাহিত্য সেই পরম সত্যানুসন্ধানের মস্তবড় অঙ্গীকারপত্র॥

শহীদুল্লাহ সাহেব জীবন্ত বিশ্বকোষ। দেশ-বিদেশের ভাষা ও সাহিত্য মন্থন করে নিজেব জ্ঞানবৃক্ষকে তিনি সমৃদ্ধ কবেছেন। জ্ঞান আহরণই তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ এজন্যে রসিকতা করে নিজের নাম রেখেছেন "জ্ঞানানন্দ স্বামী"। গ্রন্থ ও বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর মধ্যে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভার সম্পূর্ণ পবিচয় পাওয়া যায় না। সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে তাঁর মত মনীষাব পূর্ণ পরিচয়টি ধরা পড়ে। যাঁরা তাঁব সংস্রবে এসেছেন তাঁবা জানেন যে তাঁর সহজ পাণ্ডিত্যের পরিধি কত বিস্তৃত এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর বাক্যালাপে কত নতুন তথ্য কিংবা নতুন করে চিন্তা করাব মত বস্তু পাওয়া যায়। বাইরে স্বল্পবাক্ ও মৃদুভাষী, দেখতে ছোটখাট মানুষটি হ'লে কি হবে অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন বৈঠকী মানুষ, উপভোগ্য গল্প-উপাখ্যানের মাধ্যমে হাস্য-পরিহাস করেন। কর্মশক্তি ও মনস্বিতা তাঁর অসাধারণ হ'লেও আসর জমাতে তাঁর জুড়ী মেলা ভার। ধর্মীয় নিয়মনিষ্ঠ হ'লেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। এই সংস্কারমুক্ত উদারতাই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মননশীলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা শহীদুল্লাহ সম্পর্কেও অসঙ্কোচে উচ্চারণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,-- অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি। যে কোনো বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন ও সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহব্যাপার অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাঁকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ ক'রে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিষটি বড়ো বিরল।" (হরপ্রসাদ-

সংবর্ধন-লেখমালা : ২য় ভাগ)। তাই তিনি আজ শুধু একটি নামে পরিচিত নন, তিনি নিজে আজ পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর জ্ঞানালোকেব উৎস থেকে কত যে তরুণ গবেষক পথের হদিশ পেয়েছেন, পাচ্ছেন এবং পাবেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর সাধনার ফলশ্রুতি আজ সমগ্র দেশের গবের ও গৌববের বস্তু। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মত যাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ নেই বুদ্ধিজীবী সাজাব জন্য পাণ্ডিত্যের কসরৎ করেন তাঁদের মত পণ্ডিত তিনি নন। উনিশ শতকের রেনেসাঁব যে মূল মন্ত্র ছিল দেশের প্রাচীন জ্ঞানসাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের সজীব চিন্তাধারার সংমিশ্রণে বিশ্ব-কোষিক মুক্ত জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, যাব চর্চা করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই ধাবার তিনি সর্বশেষ প্রতিনিধি। তাঁর সাহিত্য-সাধনা গত যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে সেতুস্বরূপ বিদ্যমান।

'ভারতী' পত্রিকাব ১৩১৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শহীদুল্লাহ সাহেবের 'মদনভস্ম' নামে একটি প্রবন্ধ প্রথম ছাপা হয়। এই প্রবন্ধের গোড়ায় ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী লেখকের প্রশংসা করে লিখে-ছিলেন, "নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি একজন মুসলমানের লেখা। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তরে কত দূর প্রবেশলাভ করিয়াছেন এই প্রবন্ধটি তাহার পরিচায়ক। আজকাল বাংলা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যরূপে গ্রহণের দিকে মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যেও একটি চেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইহা বড়ই সুখের বিষয়। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের যতই মতভেদ থাকুক – আমরা উভয় সম্প্রদায়ই বাঙালী, বিধাতার বিধানে আমাদের উভয়কেই একত্রে বাঁচিতে মরিতে হইবে। এ অবস্থায় আমাদেব মধ্যে সাহিত্যের একতা বিশেষভাবে প্রার্থনীয় : কেননা সাহিত্যই পরস্পরেব মিলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্তমান লেখকের আমাদের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া তাই আমরা অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি।" সাহিত্যই হিন্দু-মুসলমান মিলনের শ্রেষ্ঠ উপায়— ভারতী সম্পাদিকার এই বক্তব্যই শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ ছাপা হ'লেও প্রথম গ্রন্থ "Les chants Mystiques de Kanna at de Saraha" ১৯২৮ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ বেরিয়েছে ১৯৩১ সালে। ১৩২৫ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে তিনি যত প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত পনেরটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে 'ভাষা ও সাহিত্য' নামে গ্রন্থ বেরোয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'প্রবাসী' বলেছিলেন, "লেখক সুপণ্ডিত ও শিক্ষিত অধ্যাপক। তিনি প্রবন্ধগুলি জ্ঞানবত্তার সহিত চিন্তাসহকারে লিখিয়াছেন এবং নিরপেক্ষভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তকখানির ভাষা 'মুসলমানী বাংলা' নহে।" (ভাদ্র ১৩৪০)। মনে রাখা দরকার তাঁর মুসলমানী বাংলা লেখার কটাক্ষ করে 'প্রবাসী'তে কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সেজন্যে 'প্রবাসী' গ্রন্থের ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে 'মুসলমানী বাংলা নয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

শহীদুল্লাহ সাহেব বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইংরাজী ও বাংলাতে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সিকি ভাগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজীতে ইসলাম সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে 'Essays on Islam' গ্রন্থ বেরিয়েছে (১৯৪৫)। শুনেছি ডঃ আনওয়ার দীলের সম্পাদনায় তাঁর ভাষাতত্ত্বের ওপর ইংরেজী প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে লাহোর থেকে প্রকাশিত হবে। তাহলেও তাঁর ইংরেজী ভাষায় অনেক প্রবন্ধ থেকে যাবে যা দিয়ে অনায়াসে আরও চার-পাঁচখানা বই স্বচ্ছন্দে বেরুতে পারে।

শহীদুল্লাহ সাহেবের সাহিত্য-সাধনা তিনটি ধারায় প্রবাহিত— বাংলা সংস্কৃতি, ইসলামী ঐতিহ্য ও রবীন্দ্র তথা আধুনিক ঐতিহ্য। এই তিন সম্মিলিত ঐতিহ্যের সিদ্ধাচার্য তিনি, কেননা জীবন ও সাহিত্যে এই ত্রিধারার সম্মেলন ঘটিয়েছেন। এই পটভূমিকায় তাঁর বিচিত্র বিষয়ের বাংলা প্রবন্ধগুলিকে দাঁড় করিয়ে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— ১. ভাষাতত্ত্ব ও লিপি, ২. ধর্ম ও সংস্কৃতি, ৩. প্রাচীন সাহিত্য, ৪. জীবনী-সাহিত্য, ৫. বিবিধ। ভাষাতত্ত্ব ও লিপি বিষয়ক

গ্রন্থ হচ্ছে 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৫৯), 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩৪২), 'আমাদের সমস্যা' (১৯৪৯), 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৩১); ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ 'শেষ নবীব সন্ধানে' (১৯৬১), 'ইসলাম প্রসঙ্গ' (১৯৬৩), প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের কথা— ১ম ও ২য় (১৯৬৩, ১৯৬৫); জীবনী সাহিত্য 'ইকবাল' (১৯৪৫), বিদ্যাপতি— আলাওল— হাফিজ— উমর খয়্যামেব জীবনী। বিবিধ পর্যায়ে বঙ্কিম— ববীন্দ্রনাথ— নজরুল সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনা, বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণাদিতে সাহিত্য ও সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে ইঙ্গিতমূলক প্রবন্ধাদি পড়ে। এই গ্রন্থে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা কবা হয়েছে। কাজেই এখানে সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না কবে অন্যান্য প্রবন্ধে তাঁর অনুচিন্তনেব বিষয় আলোচনা করছি।

বৌদ্ধগান ও দোঁহা বা চর্যাপদ আবিষ্কাব করে ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসেব এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। ঐ চর্যাপদেব ওপর শহীদুল্লাহ সাহেব গবেষণা করে বাংলা ভাষাব উদ্ভব ও প্রাচীনতা সম্পর্কে দেশবাসীব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং চর্যাপদের ভাষা হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমীয়া বা খিচুড়ি ভাষা নয়, সেটি যে বাংলা ভাষা তা তিনি দেখিয়েছেন। ডক্টব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েব মতে চর্যাপদের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভাষা। শহীদুল্লাহ তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করে বলেছেন, "আমবা বৌদ্ধগানের বাঙ্গালা ভাষাকে পশ্চিমবঙ্গের বলিয়া নির্দেশ না করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা কিংবা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বলা সঙ্গত মনে কবি।" (বৌদ্ধগানের ভাষা : বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড)। চর্যার পুঁথিটি ষোড়শ শতকের হলেও শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে চর্যাগীতিগুলি ৬৫০ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। তাঁর মতে চর্যা-রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল মীননাথ সপ্তম শতকের মধ্য ভাগ, কানুপা বিরূপা কুক্কুরীপা কম্বলাম্বর আর্যদেব কঙ্কণ মহীধর ধর্মপাদ ভদ্রপাদ অষ্টম শতক, শবরীপা সপ্তম-অষ্টম শতক (৬৮০—৭৬০ খৃঃ), ইন্দ্রভূতি ৭০০—৮০০ খৃঃ, লুইপা

৭৩০—৮১০ খৃঃ, ডোম্বীপা ৭৯০—৮৯০ খৃঃ, দারিকপা অষ্টম-নবম শতক, বাণীপাদ চৌরঙ্গীপা নবম শতকের প্রথমার্ধ, তেলিপা ৯৯০ খৃঃ, নারোপা ১০৩৯ খৃঃ, ভুসুকু শান্তিদেব দশম শতকের শেষার্ধ, সরহ একাদশ শতক। তাঁর এই কালনির্ণয়ে অনেকেই একমত নন। তবে একথা স্বীকার্য যে তাঁর মত অধিকতর গ্রহণযোগ্য এদিক দিয়ে যে তিব্বতী-নেপালী ভাষায় মূল গ্রন্থগুলির সঙ্গে তাঁব সরাসরি যোগাযোগ আছে। চর্যাপদেব ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা তিনি প্রথম করেছিলেন। এবং ঐ বিষয়ে গবেষণা কবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পান। চর্যাগীতি সম্পর্কে তাঁব শ্রমসাধ্য গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বাংলার সিলেবাস তৈরী কবার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয় তখন তিনি চর্যাপদ পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেন চর্যাপদের সময় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। চর্যাপদের ওপর আলোচনা তখন অত্যন্ত সীমিত ছিল, সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় তিনি কিছু আলোচনা করেছিলেন (১৩২৭, ১৩৪৮, ১৩৪৯)। ছাত্রদের অসুবিধে হওয়ায় তিনি নিজেই ঢাকা সাহিত্যপরিষদ-পবিচালিত "প্রতিভা" কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। যেমন—

কার্তিক-পৌষ ১৩২৯—সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা
চৈত্র ১৩২৯—কানুপার দোহার টীকা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩০—সিদ্ধা কানুপা
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২—সিদ্ধা কানুপার গীতের ভাষা

এখনও মধ্যে মধ্যে তিনি চর্যাপদেব ওপর প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য পত্রিকায়' তাঁর চিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে (যেমন ১৩৬৪ বর্ষা সংখ্যা 'বৌদ্ধগানের ভাষা', শীত সংখ্যায় 'কানুপার কালনির্ণয়', ১৩৭০ শীতসংখ্যায় 'চর্যাপদের পাঠ আলোচনা')। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে 'Dacca University Studies' পত্রিকায় চার্যাপদগুলির বিস্তারিত পবিচয়সহ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে উক্ত অনুবাদ

'Buddhist Mystic Songs' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। চর্যাপদ সম্বন্ধে তিনি একজন অথরিটি। এই অথরিটি সম্পর্কে সব বিশেষজ্ঞরাই একমত। স্বয়ং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'The Origin and Development of the Bengali Language' (1926) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, "The importance of the carya-padas has not been sufficiently appreciated in Bengal, and only about half a dozen papers or notes on them have been published so far by Bengali scholars. The only valuable article is by Maulvi Muhammad Shahidullah, now of the department of Sanskritic studies in the University of Dacca ; his paper (in the Vangiya Sahitya Parishad Patrika, 1327 pp. 145-152) offers very satisfactory readings of some obscure passages, and on the whole is extremely helpful and suggestive." (vol I p. 118 Footnote).

চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কেও ডক্টর শহীদুল্লাহ নতুন আলোকপাত করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণা ছিল যে বড়ু চণ্ডীদাসই একমাত্র চণ্ডীদাস। প্রথম জীবনে তিনি অসংযমী ছিলেন। সেজন্য তিনি দেহ-বিলাসী কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। পরে তিনি সংযমী হন, পরিণত বয়সে পদাবলী প্রেমসঙ্গীত রচনা করেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলীর' প্রথম খণ্ডে বড়ু চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদ তাঁরা উল্লেখ করেছেন। শহীদুল্লাহ সাহেব পদাবলী চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচীনতা নিয়ে তিনি 'বাঙালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এবং 'বড়ু চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন পদাবলীর চণ্ডীদাস পদকে 'বড়ু' ভণিতার দ্বারা বিশেষিত করা ভুল, কেননা "ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদন

জ্বালা নাই।" 'চণ্ডীদাস সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন তুলনা করে দেখিয়েছেন "১. বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে; তাহার মধ্যে (ক) কোনও স্থানে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বা 'দীন' চণ্ডীদাস নাই (খ) সর্বত্র 'গাএ' বা গাইল আছে, কোথাও 'ভণে' 'কহে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (গ) ভণিতা কখনও উপান্ত্য চরণে হয় না। ২. বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদুমা বলিয়াছেন। ৩. বড়ু চণ্ডীদাস রাধাব কোনও সখী বা শাশুড়ী ননদের নাম উল্লেখ কবেন নাই। তিনি 'বড়ায়ি' ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধনও কবেন নাই। ৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী, প্রতিনায়িকা নহেন। ৫. বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। ৬. বড়ু চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম অর্থে 'নেহ' বা 'নেহা' ব্যবহার কবিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চারিস্থলে 'পিরীতি' শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। ৭. বড়ু চণ্ডীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'শ্যাম' ব্যবহার করেন নাই। ৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র। রাজকন্যা নহেন। অধিকন্তু ৯. চণ্ডীদাসের নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত। ১০. বড়ু চণ্ডীদাসে সখীকে সম্বোধন করিয়া কোনও পদ রচিত হয় নাই। এইগুলি কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের তাহাতে সন্দেহ থাকে না।" সেজন্যে তাঁর মতে চণ্ডীদাস তিনজন বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত সাহিত্যের ইতিহাসের অধিকাংশ গবেষক মেনে নিয়েছেন।

ধর্মঠাকুরকে শহীদুল্লাহ সাহেব বৌদ্ধ বলে মনে করেন, কেননা "নিরঞ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও আদিবুদ্ধ-মতের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়"। পববর্তীকালে ধর্মপূজা-বিধানে লৌকিক হিন্দুধর্ম ও ইসলামের প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেছেন, "ধর্মপূজা হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধমতের (মূলতঃ শূন্যবাদের) মিশ্রণে উৎপন্ন।...ধর্মপূজা বিধান হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্মপূজায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,

গণেশ, সূর্য প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার পূজা আছে ; ব্রাহ্মণী মহেশ্বরী বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তির পূজা আছে ; বিষহরী বাশুলী মঙ্গল-চণ্ডিকা ষষ্ঠী বিশালাক্ষী— এই লৌকিক দেবতাগুলির পূজা আছে। …ধর্মপূজায় কিছু মুসলমান-প্রভাব আছে। এই প্রভাব অবশ্য অনেক পরবর্তী-কালের।…ইসলামের প্রভাবে নিরঞ্জন খাঁটি একেশ্বরবাদের ঈশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন।" 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্য পুরাণে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৩৬) শহীদুল্লাহ সাহেবের শূন্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে এক বিস্তারিত আলোচনা সংযোজিত হয়।

বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া, খনার বচন, হেঁয়ালী, প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করার কথা তিনি তাঁর কর্মজীবনের প্রথম থেকেই বলে আসছেন, কিন্তু আশানুরূপ উৎসাহ আমাদের মধ্যে তিনি পান নি। তাই পূর্ব-ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে (আষাঢ় ১৩৪৫) তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে সত্য। কিন্তু তাহার ভাব বিদেশের আমদানী। খদ্দরের কাপড়ে আমরা বিলাতী সুট তৈয়ারি করিতেছি। দেশী খাটে শুইয়া বিলাতের স্বপ্ন দেখিতেছি।…বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা কর ভালই ; কিন্তু স্বদেশী ভাষা ও স্বদেশী সাহিত্যের সেবায় ক্রটি করিও না। স্বদেশী সাহিত্যের সেবায় দেশপ্রীতি জাগিবে, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ঘুচিবে, স্বরাজ্য আসিবে।" তাঁর এই ভাষণটি পড়ে দীনেশচন্দ্র সেন মুগ্ধ বিস্ময়ে লিখেছিলেন, "আপনি এত লেখাপড়া শিখিয়াও বাঙ্গলার পল্লীমায়ের স্নিগ্ধ আহ্বান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আপনিই প্রকৃত দেশভক্ত ও শিক্ষিত। যাঁহাদের শিক্ষার অভিমান আকাশস্পর্শী, অথচ মাতৃভাষাকে যাঁহারা অবজ্ঞা বা কৃপার চোখে দেখেন, তাদের বিদ্যাবুদ্ধির অনুরাগী আমি নহি।" 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ১ম ও ২য় খণ্ড লোকসাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার সঙ্গে রয়েছে বিশ্লেষণধর্মী সংবেদনশীল অনুভূতি।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ সম্পর্কে যা কিছু গবেষণা ও চিন্তা তিনি করেছিলেন তারই কিয়দংশ সংকলিত হয়ে 'বাংলা সাহিত্যের কথা' দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের নিবেদনে বলেছেন, "আমি ১৯১৯ ইং সাল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত আছি। এই সম্বন্ধে আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ বিবিধ পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিকে সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু নূতন রচনা সংযোগ করিয়া এই 'বাংলা সাহিত্যের কথা' প্রকাশিত হইল।" (২০.৪.৫৩)। প্রাচীনকাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যদিও তাঁর বইটি ইতিহাস নয়, বিভিন্ন সময়ে লিখিত গবেষণামূলক কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি, কিন্তু বইটির বৈশিষ্ট্য এমনই যে সাহিত্যের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বাদ পড়ে নি। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও তাঁর সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না। বিশেষ করে তাঁর চর্যাপদ, চণ্ডীদাস সমস্যা, শূন্যপুরাণ, বিদ্যাপতি-কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল, পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কাব্য, সৈয়দ আলাওল সম্পর্কিত তথ্যাদি ইতিহাস রচনার পক্ষে বিশেষভাবে সমাদৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেছেন, "প্রথম খণ্ডে রয়েছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রসূত ও প্রভাবিত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। এ তাঁব জীবনব্যাপী গবেষণা ও সাধনার ফসল।...দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রধানতঃ পরিচিতিমূলক হলেও এতেও গবেষণা ও বিতর্কলব্ধ নতুন সিদ্ধান্তের অভাব নেই। এর 'অনুবাদ-সাহিত্য' অধ্যায়টি তত্ত্বে ও তথ্যে ঋদ্ধ। চৈতন্য-সাহিত্যেও তিনি অনেক বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন।...সব ভাল লেখার পেছনে থাকে সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন। এ লেখার পিছনেও পাই একটি সত্যসন্ধ উদার, সরল ও সুন্দর মন; মাতৃভাষার প্রতি মমতা-স্নিগ্ধ এক রসিক চিত্ত— যা গুণগ্রাহিতার ঐশ্বর্যে আর উদারতায় সরস এবং সাবলীল ...সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। ছোট ছোট

সরল বাক্যযোগে ইনি জটিল কথাকেও রূপকথার ন্যায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁর এ ভঙ্গি অনেককেই মুগ্ধ করে। লেখার ঢঙও শক্তির পরিচায়ক বই কি।" (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭২ ও শীত সংখ্যা, ১৩৬৫)। নিরবধি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধনশীল অনুসন্ধানের ফলে তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত হতে পারে যা অগ্রগামী গবেষকের স্বাভাবিক নিয়তি, কিন্তু জ্ঞানতপস্বীরূপে তাঁর খ্যাতি চিরকাল অম্লান থাকবে।

প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষার ওপর গবেষণা তাঁর পণ্ডিতোচিত জীবনের অবিনশ্বর কীর্তিরূপে বিরাজ করতে পারত কিন্তু তাকেই তিনি যথেষ্ট বলে মনে করেন নি। বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর সমান আগ্রহ ও কৌতূহল আছে। দেশ ও সমাজের প্রতি সাহিত্যিক-রূপে তাঁর দায়িত্বের কথাও তিনি বিস্মৃত হন নি। সেখানেও তিনি সরকার ও জনতাকে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। পাকিস্তানে একদল বাংলা অক্ষরের উর্দু হরফ করার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই আবার বাংলা ভাষাকে পূর্ববঙ্গের চলিত ভাষার ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তাঁদের যুক্তি হল যে বাংলা ভাষা প্রায় বার আনা গাঙ্গেয় সংস্কৃতি-প্রভাবিত। কাজেই পূর্ববাঙলার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে পূর্ববঙ্গের চলিত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এইসব অবাস্তব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়েছেন। সারাজীবন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, "কতকগুলি অ-সাহিত্যিক গোঁড়া রাজনীতিক বাংলা অক্ষর এবং ভাষাকে গায়ের জোরে বা আইনের জোরে রাতারাতি বদলাইতে চাহিলেও বাংলা ভাষা প্রবল নদীপ্রবাহের ন্যায় নিজের মরজিমত আপনার গতিপথ বাছিয়া লইবে। বাহিরের কোনও শক্তিই তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। ভাষা পরিবর্তনশীল, সুতরাং পরিবর্তন আসিবেই। কিন্তু তাহা ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে, কাহারো হুকুম বা ইচ্ছানুসারে নহে।‥ কোনও কোনও রাজনীতিক বলিতেছেন পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা

পূর্ববঙ্গের চলিত ভাষার উপর স্থাপিত হইবে। এই মতবাদের কারণ কি, আমি বুঝিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাজনীতিগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ভাষাগত তো শত্রুতা নাই। যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও কথায় আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। ভারতের অন্তর্গত দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের উর্দু ভাষা হইতে পাকিস্তানের উর্দুকে পৃথক করিতে হইবে, এমন কথা তো কাহাকেও বলিতে শুনি না। আমেরিকা ইংলণ্ডের সহিত স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইংরাজী ভাষা তো ছাড়ে নাই। অষ্ট্রো-হাঙ্গারী ও জার্মানী দুটি পৃথক রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু তাহাদের তো একই জার্মান ভাষা ছিল।...কিন্তু পূর্ববঙ্গে বহু উপভাষা আছে, তাহার কোন্‌টি গ্রহণ করা হইবে?... তারপর জিজ্ঞাস্য যে, ব্যাকরণও কি পূর্ববঙ্গের হইবে? এখন কেহ বলিতে পারেন, আমি ঢাকা জেলার লোক, কেন অন্য জেলার ভাষা বলিব বা লিখিব? এইরূপে প্রত্যেকে যদি সাহিত্যে নিজ নিজ স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করিতে থাকেন, তবে সে কি একটি Tower of Babel সৃষ্টির মত হয় না?" (সিলহেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ১০. ১০. ৫৩)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরূপে তাঁর দৃঢ় ধারণা যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা, জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষাতেই রচিত হওয়া দরকার। তিনি বলেছেন, "কোন জাতি কেবল বিদেশী ভাষার চর্চায় কখন বড় হইতে পারে নাই। ইউরোপ যখন লাটিন ছাড়িয়া দেশী ভাষা ধরিয়াছিল, তখন হইতেই ইউরোপের অন্ধকার-যুগের অবসান হইয়া আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ভ হইয়াছে। যেদিন ইংল্যাণ্ড নর্মান-ফ্রেঞ্চ ত্যাগ করিয়া তাহার এক সময়ের ঘৃণিত স্যাকসন ভাষাকে বরণ করিয়া লইল, সেইদিন ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের উন্নতির সূত্রপাত হইল। যখন হইতে জার্মানী ফরাসী ভাষার মোহ-পাশ কাটিয়া তাহার মাতৃভাষাকে পূজার স্থান দিল, তখন হইতে জার্মানীর জাতীয় উন্নতির আরম্ভ হইল।" (বাংলা সাহিত্য ও ছাত্র-সমাজ : ভাষা ও সাহিত্য)।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবে তিনি সানন্দে অংশ গ্রহণ করেন। বঙ্কিম-সাহিত্য মুসলমান বিদ্বেষী বলে অন্যান্য মুসলমান সাহিত্যিকদের মত তিনি গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব সমর্থন করেন নি কিংবা তাঁকে মুসলমান-দের শত্রুরূপে দেখেন নি ববং সাহিত্যনিবপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদেব মধ্যে হিন্দু-মুসলমানেব মিলনেব চিত্রটি তুলে ধরেছেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মৃতি-পুস্তক (Souvenır) প্রকাশের জন্য ঢাকায 'বঙ্কিম-স্মৃতি মন্ত্রণাপবিষদ' গঠিত হয। এই মন্ত্রণা পবিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৩৪৫ সালেব ৮ই শ্রাবণ ঢাকা বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বিতীয অধিবেশনে তিনি "সাম্যবাদী বঙ্কিম" শীর্ষক এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ কবেন। পবে ঐ প্রবন্ধটি স্মৃতি-পুস্তক গ্রন্থে (বঙ্কিম-স্মৃতি : সম্পাদক মোহিতলাল মজুমদাব ও শ্রীশচন্দ্র দাশ) প্রকাশিত হয়।

শহীদুল্লাহ সাহেবেব অন্যতম প্রিয বিষয ববীন্দ্র-সাহিত্য। বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কবতে হ'লে ববীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা যায় না, কেননা তিনিই আমাদেব বাংলা ভাষাকে বিশ্ব-সাহিত্যেব পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। ববীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকেব এক রসসমৃদ্ধ সমালোচনা 'প্রবাসী' ১৩৫২ সালেব শ্রাবণ সংখ্যায প্রকাশিত হয। 'বাজা' নাটকেব অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি উদ্ঘাটিত কবে তিনি বলেন, "ভালবাসা, বিরহ, মিলন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমাস্পদ, উৎসব-উদ্যান, রণক্ষেত্র, নৃত্য, গীত, যুদ্ধ-বিগ্রহ যাহা কিছু নাটকে গতি দান করে, বৈচিত্র্য সৃষ্টি কবে, সমস্তই এই 'বাজা' নাটকে আছে। বানীব মনে গভীব বিষাদ। বাহিবে প্রমোদবনে আনন্দ-উৎসব। ইহাতে নাটকে একসঙ্গে আলো-আঁধারের বৈচিত্র্য দান কবিযাছে। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত না হইলেও দৃশ্যকাব্যের সকল লক্ষণই ইহাতে আছে। প্রেমাস্পদের আলিঙ্গনান্তে তাহাব প্রেমের অনুভূতি যেমন দেহ-মন আনন্দ-বিহ্বল করিয়া বাখে, তেমনই 'বাজা' নাটকের অভিনয়-শেষে তাহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মধুর রসটি সমগ্র হৃদয-মন ভাবাবিষ্ট কবে। নাট্যকারের চবম সার্থকতা এইখানে।" (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা-গ্রন্থ)।

পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্য নাকি প্রধানতঃ হিন্দু-সাহিত্য, মুসলমান ধর্মের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। অতএব পাক-বেতারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সম্প্রতি পূর্ববাঙলার অধিবাসীদের আন্দোলনের ফলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। শহীদুল্লাহ সাহেব রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন ভক্ত বিশেষজ্ঞ পাঠক। তিনি পূর্ববাঙলার অধিবাসীদের বহু আগে থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্য একান্ত নিজের করে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন, কেননা দেশ-কাল অতিক্রম করে তিনি এমন এক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন যা জাতির মানসগঠনে সহায়তা করবে। তিনি একটি ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "তের শ বৎসরের অধিককাল পূর্বে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও শেষ নবী (দঃ) জলদগম্ভীর রবে ঘোষণা করেছিলেন—"লা রুহ্‌ বানিয়্যতা ফি-ল ইসলাম"—ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নাই। রবীন্দ্রনাথ যেন তারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।··· রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্ববাসী। ··এই যে বিশ্ববাসী হবার ইচ্ছা এটি রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ও বচনে বাস্তবায়িত করেছিলেন।···তাঁর বাণীও বিশ্ববাসীদের জন্যে।···তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশ্বজনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।···বিশ্ব নবী (দঃ) বলেছেন—'কলিমতুল্ হিক্‌মতি দাল্লাতুল হকীমি হয়সু ওজদহা ফহুওআ আহক্কু বিহা'—জ্ঞানের বাক্য জ্ঞানীর হারান ধন, যেখানেই কেউ তাকে পাবে, সেই তার হকদার হবে। আমরা পাকিস্তানীরা রবীন্দ্রনাথের উচ্চ ভাবধারাকেও আমাদেরই জিনিস বলে দাবী করতে পারি।···পাক-ভারতের এই মনীষীকে উপযুক্ত সম্মানজনক স্থান দিব এবং তাঁর সত্যবাণীকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করব। মনে রাখতে হবে, যে দেশে গুণীর সম্মান নাই, সে দেশে গুণী জন্মাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ অমর!" 'পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ' 'মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ' 'চিত্রাঙ্গদার সমালোচনা' নামে তাঁর আরও কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল রবীন্দ্রসাহিত্যও পড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্র-

সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর সমালোচনাবোধের তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান।" শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই সহজ ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করেন এবং এই পরিচয়ে নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নন। তিনি বলেছেন, "এদেশের অধিকাংশ মুসলমান যে পূর্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল তাহা নিশ্চিত"। কিন্তু একথা স্বীকার করতে একশ্রেণীর বাঙালী মুসলমানদের আভিজাত্যে লাগে। আভিজাত্য ধুয়ে জল খেলে আত্মপ্রসাদলাভ হতে পারে, তা দিয়ে জাতীয় দৈন্য ঢাকা যায় না। শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দুসমাজ যেভাবে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে তদনুপাতে মুসলমান সমাজ অগ্রসর হতে পারে নি। অথচ বাঙলাদেশে হিন্দুমুসলমান বসবাস করে—উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য একান্তভাবে আবশ্যক। রাজনৈতিক সভা-সমিতি করে সেই ঐক্য গড়া যায় না, কেননা হিন্দু-মুসলমানের অসম ঐক্য কখনও দৃঢ় হতে পারে না, যতক্ষণ না মুসলমান সম্প্রদায় নিজেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমকক্ষ করে তুলতে পারে। তাই স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন, বাঙালী হিন্দু নবজাগরণের প্রতি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছেন, "বহু শতাব্দীর পরাধীন আমাদেরই স্বদেশী হিন্দুভাইগণ আজ কেন সকল রকম উন্নতির জন্য কোমর বেঁধে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, আর আমরাই বা কেন অনড় অটল পাথরের মত জড় জীবন নিয়ে পরম তৃপ্তিতে কাল কাটাচ্ছি ?...সত্য কথা বললে তিক্ত লাগবে, কিন্তু না ব'লে চারা নেই ; তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রাণেও যে স্বাধীনতার অনির্বাণ আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে, তা আমাদের অতিবড় হোমরাচোমরা নেতাদের মধ্যেও নেই।...তরুণ বন্ধুগণ! আমি তোমাদের মধ্যে সকলের আগে এই বড় হওয়ার বড় ইচ্ছা দেখতে চাই। এ ছাড়া বড় হওয়ার আর কোন দোসরা পথ নেই। বড় আশাকে চারিদিকে সংক্রামক

ক'রে দাও, তারপর দেখবে, কি তাজ্জব ব্যাপার ঘটে ওঠে।" (চাঁদপুর মুসলিম যুবক-সমিতির অধিবেশনে সভাপতিব ভাষণ—২.৫.১৯৩৭)। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা দূর করতে হলে প্রথমত শিক্ষার দরকার এবং শিক্ষিত হয়ে দেশসেবার যোগ্যতা অর্জন করার কথাও তিনি বলেছেন, "একটা কানা, খোঁড়া, রোগা পশুকে কেউ কুরবানী কবে না। তাব জন্য চাই একটা তাজা হৃষ্টপুষ্ট জীব। নবীনের দল, জানি তোমরা কুরবানীর জন্য গলা বাড়াতে কখনই কাতব নও। কিন্তু ভেবেছ কি, তোমাদের আত্মবলির মূল্য কি? শূন্য তবিল কেউ ভিখারীকে দেয় না। আর তুমি তোমাব শূন্য মাথা তোমার জন্মভূমিব পায়ে উপহাব দিতে চাও? · দেশে ও দেশের বাহিরে যত পার জ্ঞান কুড়াইয়া আন। জ্ঞানেব মনিমাণিক্যে তোমার মাথা ভূষিত কর। তারপর দাও সে মাথা লুটিয়ে দেশের জন্য, দশের জন্য। এই প্রকৃত মস্তকদান। পড়! পড়! নতুন পুরোনো সকল ভাবের সৌন্দর্য লুট করে তোমাব মনকে সুন্দর কব। তারপর সঁপে দাও সেই মন দেশেব সেবায়, দশেব সেবায়।" (নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক-সম্মেলন: অক্টোবব, ১৯২৮)। দ্বিতীয়ত মুসলমান-সাহিত্য সৃষ্টিব প্রয়োজন। তার মানে নয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্য গড়ে তোলা, মন্দির-মসজিদের মত পৃথক পৃথক সাহিত্য সৃষ্টি করা। তিনি দুঃখ কবে বলেছেন, "শিক্ষা বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে চাই সৎসাহিত্য গড়তে।...আমাদের সাহিত্য নেই বললেই হয়। বাংলা সাহিত্য আছে, কিন্তু আমাদের সাহিত্য নেই। আমাদেব ঘর ও বা'র, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দুজীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভেতর দিয়েই বাংলার

হিন্দু মুসলমানের চেনা-পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে। To know is to love !" (ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজে অভিভাষণ, ১৩৩৫)। তাঁর মত বিশ্লেষণ করলে কথাটা এই দাঁড়ায় যে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ-জীবন, তার শিক্ষাদীক্ষা, তাব রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, চালচলন, সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসা ইত্যাদির লোকায়ত ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পবিচয় সাহিত্যে রূপ দিতে হবে, যাতে কবে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে চিনে নিতে পাবে। লেখক জাতিতে মুসলিম হলেই তাকে মুসলিম সাহিত্য বলা যায় না। মুসলমান-সংস্কৃতিকে যাঁরা রূপ দিয়েছেন তাঁরা হিন্দু হোন আর মুসলমান হোন, শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁদের সাহিত্যকেই মুসলিম সাহিত্য বলতে চান। এজন্যে গিরিশচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামপ্রাণ গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারায় হিন্দু সংস্কৃতিব প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই সুস্পষ্ট। সেই সাহিত্য পাঠ করে মুসলমান সমাজ যেমন হিন্দুকে চিনতে পারে, তেমনি মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতি-প্রভাবিত সাহিত্য পাঠ করে হিন্দুসমাজও তাকে চিনুক এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলেছেন, "সাহিত্য জাতির মনোভাবের ছাপ বয়। জাতির ভাবধারা তার কালচারের সৃষ্টি। কাজেই এক বিশেষ কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির বা সম্প্রদায়েব সাহিত্য এক বিশেষ রূপ ধারণ করে। আমরা বাঙ্গালী যেমন সত্য, তার থেকে বেশী সত্য আমরা মুসলমান। আমাদের একটা বিশেষ কৃষ্টি আছে। যদি বাংলা সাহিত্যে আমাদের সেই কৃষ্টির ছাপ না থাকে, তবে সে সাহিত্য আমাদের কাছে বিজাতীয় সাহিত্যের মতই ঠেকবে। লেখক মুসলমান হলেই তার লেখা সাহিত্য মুসলমান সাহিত্য হতে পারে না, যদি না তাতে মুসলমানীত্ব থাকে।··· মুসলিম সাহিত্য মানে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নয়। প্রকৃত সাহিত্য সার্বজনীন না হয়ে থাকতেই পারে না।···কৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিত্ব এমন ওতপ্রোতভাবে জড়ান যে, যেমন সম্মোহিত ছাড়া কেউ নিজের ব্যক্তিত্ব সহজে ছাড়তে পারে না বা চায় না, তেমনি কৃষ্টিও ছাড়তে

পারে না বা চায় না। তাই শতাব্দীর ঘুমের শেষে সদ্য জাগরিত বাঙ্গালী মুসলমানের প্রাণ আজ চাচ্ছে বাংলা বীণায় হিজায ও শীরাযের অপূর্ব রাগিণী শুনতে। তা না হলে তার প্রাণের পিপাসা মিটবে না।" (নেত্রকোণার মুসলিম সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণ, ১৩৩৬)। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মত হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি মিলিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে এক অখণ্ড বাঙালী জাতির সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হোক এই ইচ্ছাই তিনি সারাজীবন লালন করে এসেছেন। শুধু কথা নয় কাজও তিনি করেছেন। ইসলাম ধর্ম ও সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদ করে সাধারণের গোচরীভূত করেছেন। মুসলমান সমাজ-জীবনের কিছু চিত্রও তিনি তাঁর ছোট গল্পে এঁকেছেন। বাঙলা-দেশের মুসলমানকে তার নিজস্ব ধর্ম ও ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তিনি যেমন মূল আরবী ফারসী থেকে কুরআন-হাদীসের অনুবাদ করেছেন তেমনি তার ব্যাখ্যাস্বরূপ অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সব প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে ইসলাম ও হযরত মুহম্মদের (দঃ) আদর্শ এখনো কতটা যুগোপযোগী আছে। বর্তমান বিশ্বজগতে ইসলাম কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তাও তিনি ঐতিহাসিক সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরিবেশন করেছেন। যেমন 'কুরআন শরীফ ও জ্যোতিষ', 'কুরআন শরীফ ও পুনর্জন্মবাদ', 'কুরআন শরীফ ও বিজ্ঞান', 'কুরআন শরীফ ও যুদ্ধনীতি', 'কুরআন শরীফে দুঃখতত্ত্ব', 'কুরআন শরীফের মহিমা', 'ইসলাম ও বিশ্বসেবা', 'ইসলাম মানবতার মুক্তির দূত', 'ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ', 'ইসলামী সমাজের রূপ', 'সত্যের সংগ্রামে মহানবী', 'হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ও মানবাধিকার', 'বিশ্বের দরবারে হযরত মুহম্মদ (দঃ)' প্রভৃতি। মুসলমানী পাল-পার্বণের শাস্ত্রগত ব্যাখ্যা ও সমাজগত মূল্যায়নও করেছেন। 'আখেরী চাহার শুম্বা ও তাহার তারিখ', 'ঈদুল আযহা ও কুরবানীর আহ্বান', 'শবেকদর ও কুরআন' ইত্যাদি তার উদাহরণ। ইসলামী তমুদ্দুনের কথা বলার সঙ্গে তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতিও তাকে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছেন। "জাতীয় মিলনের পথে" নামক

প্রবন্ধে তিনি প্রতিটি বাঙালী মুসলমানকে আরবী নামের পাশে একটি বাংলা নাম রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রতি দেশেই মুসলমানরা তাদের দেশীয় ঐতিহ্য ত্যাগ করে না, তাদের নাম থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। যাঁরা তাঁকে গোঁড়া বলে ভাবতেন তাঁরা তাঁর দুঃসাহসে বিস্মিত হলেন।

পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র বলে শুধু ইসলামী সাহিত্য রচিত হবে কিংবা ধর্মের ওপর জোর দিয়ে সব সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে ঐ একদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে এরকম জঙ্গী মনোভাব সরকারের থাকলেও শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নেই। তিনি যেমন খাটি মুক্ত স্বাধীন মানুষ গঠনের কথা বলেছেন তেমনি সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযোগী সাহিত্যরচনা করার কথাও বলেছেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলেছিলেন, জ্ঞান আহরণের জন্য যদি চীনদেশে যেতে হয় তাই যেও। শহীদুল্লাহ্ সাহেবও বলেছেন শুধু অন্ধ স্বাদেশিকতায় মত্ত হয়ে থাকলে চলবে না, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সার্বজনীন করতে হলে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তারাজীর সঙ্গে নিত্য নতুন পরিচয় সাধন করে নিজস্ব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হবে। সে-সঙ্গে তাদের সমকক্ষ হবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। তিনি বলেছেন, "কেবল অনুবাদ ও ইসলামীয় সাহিত্য লইয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। আমাদিগকে বিশ্বের সভ্যজাতিদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে। যদি ইহাতে আমরা বিজয়ী হইতে পারি, তবে সমস্ত বিশ্ব বিজয় অপেক্ষা সেই হইবে আমাদের মহা-গৌরবময় বিজয়। শান্তিকামী সাহিত্যসেবী আমাদিগকে জ্ঞানরাজ্যের জয়যাত্রায় অভিযান করিতে হইবে। ইহাই হইবে পাকিস্তানের জ্ঞানগিরির এভারেস্ট শিখর বিজয় অভিযান।" (সিলহেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ১৯৫৩)। তাঁর এই উক্তি থেকে আমরাও প্রেরণা পেতে পারি। বিশ্বের সব কটা জানালা খুলে মুক্ত বাতাসে সাহিত্যের প্রাণরস ভরিয়ে তুললেও জাতীয় বৈশিষ্ট্যটির যেন বিসর্জন দেওয়া না হয়। সাহিত্যে পরিবেশ পরিবেষ্টনীর যেমন প্রয়োজনীয়তা

আছে তেমনি জাতীয় বৈশিষ্ট্যহীন সাহিত্য মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো। প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে তার নিজস্বতা থাকবে। তিনি বলেছেন, "নদী যেমন যে খাত দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার মাটির রং এবং স্বাদ কিছু না কিছু পায়, সেইরূপ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেও কিছু প্রকারভেদ থাকিবে। ইহার কারণ, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান আর পূর্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান, পশ্চিমবঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত আর পূর্ববঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এই local colouring কিন্তু সাহিত্যের প্রাণধর্ম যে মানবীয়তা তাহাব বিরোধী নহে বরং তাহারই এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি।"

গদ্য-লেখক হিসেবে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁর যুক্তিবাদী মন এবং বিশ্লেষণধর্মী প্রতিভা। উপমা দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে রাজমিস্ত্রী যেমন ইটের পর ইট গেঁথে প্রাসাদ তৈবী করে তেমনি তিনিও তথ্যগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে পর পর সাজিয়ে দিয়েছেন যাতে পাঠকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন অসুবিধা না হয়। ভাষাতত্ত্বের অনেক ভারী কথাও তিনি সহজ কথায় ব্যক্ত করেছেন রসিয়ে জরিয়ে রাঙিয়ে যা অন্যের পক্ষে প্রায়শই কষ্টসাধ্য। রচনারীতি স্বচ্ছ ও ভারহীন অর্থাৎ ভাষার আবরণী আছে বলে মনেই হয় না। রচনার এই প্রসাদগুণটি তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য তিনি তেমন করেন নি যা একটু করেছেন তা উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু জ্ঞানের সাহিত্য যা রচনা করেছেন তার প্রকাশভঙ্গী সহজ সাবলীল, তাও মাঝে মাঝে রচনারীতির গুণে সৃষ্টিধর্মী প্রবন্ধের স্পর্শ দিয়ে যায়। যেমন :

> সৌন্দর্যবোধ দ্বাবা মানুষের কোনই জৈব অভাব দূব হয় না। তবু কিন্তু মানুষেব মন সৌন্দর্যের জন্য পাগল। জীবন-যাত্রায় এর প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষের মনে এর প্রয়োজন আছে। এইরূপ মানুষের একটি মনোভাব প্রেম। জীবনযাত্রায় তার কোন দরকার হয়ত নেই, কিন্তু জগতে প্রেমশূন্য কোন মানুষ নেই। মানুষের এইরূপ আরেকটি ভাব অদৃষ্টে বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের

মধ্যে যে বিশ্বাস যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে—ধর্ম ও কর্মের পথে পরিচালনা করেছে—দুঃখ-যন্ত্রণা-নির্যাতনের মধ্যে আশা ও আনন্দ দিয়েছে, তা' খোদার প্রতি বিশ্বাস। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে মানুষ—বিশ্বাসী মানুষ— তাঁকে ডেকেছে এবং তাতেই সে চরিতার্থ হয়েছে। এ হচ্ছে মরমিয়া-বাদ। (মদন বাউল ও লালন শাহের কাব্যে আত্মনিবেদনের সুর : সমকাল, ভাদ্র ১৩৬৬)।

: জানি না কতদিন বঙ্গবাণী জন্মিয়া ঘরের কোণে লাজুক বধূটির মত নিরিবিলি বাস করিয়াছিল। সেদিন বাংলার অতি স্মরণীয় সুপ্রভাত, যেদিন সে সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আসরে দেখা দিল। বাস্তবিক সেদিন বাঙ্গালীর এক নব যুগের পুণ্যাহ। সেদিন তাহার আকৃতি শুধুই কবিতাময়ী, তাহার প্রতি চরণক্ষেপে বিচিত্র ছন্দের লীলাভঙ্গী, তাহার কণ্ঠে নানা মনমাতান রাগ-রাগিণী। (প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা : বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড)।

তাঁর আলোচনায় কারুকলার সুষমা কম থাকতে পারে কিন্তু চিন্তাশীলতার অবকাশ প্রচুর, কেননা তাঁর সাহিত্য-সাধনাই জ্ঞান-সাধনা। মিতভাষিতা তাঁর লেখার প্রধান ধর্ম, যেমন পরিমিতি বোধ তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণ। জ্ঞানধর্মী সাহিত্যের এই বিরল গুণটি একাধারে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সার্থক প্রমাণ। বুদ্ধির সঙ্গে অনুভূতির সামঞ্জস্যবিধান তাঁর রচনার প্রধান গুণ। পাণ্ডিত্যকে তিনি পাঠকের মাথা লক্ষ্য করে থান ইটের মত ছুঁড়ে মারেন নি— রসবোধ থাকার দরুন চুটকি গল্প ও আটপৌরে উপমা দিয়ে নীরস বিষয়ের আলোচনাকেও তিনি রসায়িত করতে পেরেছেন যা সরল অথচ জ্ঞানগম্ভীর, প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ়। তাঁর পরিচ্ছন্ন সুশোভন ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনারীতির মধ্যেও প্রতিফলিত— "Personality clothed in words."

বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মহৎ পথিকৃৎ ছিলেন গ্রীয়ারসন সাহেব। এই পথে সামান্য যে কয়জন পণ্ডিত এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অন্যতম। ভাষাতত্ত্বের জটিল অরণ্যে পথিকের সংখ্যা আগেও কম ছিল এবং এখনও কম আছে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। এখন আছেন এধারের বাঙলায় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্র ডক্টর সুকুমার সেন, ওধারের বাঙলায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও তাঁর ছাত্র মুহম্মদ আবদুল হাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষারহস্যের আলোচনা অত্যন্ত পরিমিত। এই পরিমিত আলোচকদের মধ্যমণি হয়ে আছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি কুড়িটির বেশী ভাষা জানেন। ভাষা শেখার একটা ঝোঁক তাঁর বাল্যকাল থেকেই ছিল। 'আমার সাহিত্যিক জীবন' নামক এক ছোট স্মৃতিকথায় এই সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ঘরে ব'সে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম। গ্রীক ও তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম। এই স্কুলজীবনেই ভাষা শিক্ষা আমার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ ছেলেদের মত ঘুড়ি ওড়ানো, লাটিম ঘোরানো, মারবেল খেলা প্রভৃতি খেলাধূলা না ক'রে আমি ভাষা শিক্ষা করতাম।...বলা বাহুল্য, ছোটবেলায় পাঠশালায় কুর্আন শরীফ পড়তে শিখেছিলাম ও নমায পড়ার অভ্যাস ছিল।... এই সময়ে আমি বাংলা অক্ষরে আরবী অনুলিখনের একটি নিয়ম করেছিলাম।...এই স্কুল জীবনেই ভাষাতত্ত্ব আমার একটা বাতিক ছিল।...এই সময়ে আমি সংস্কৃত ও পারসীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করি।...এই সময় আমি Philology of Tamil লিখেছিলাম।" পরবর্তীকালে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে অনেক ভাষা শিখতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আচার্য হরিনাথ দের অনুপ্রেরণাও স্মরণীয়— প্রধানত তাঁরই পরামর্শে তিনি তুলনামূলক

ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাশ করেন।

ওকালতি করতে করতে বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিত্থালয়ে আসার পর ভাষাতত্ত্বের ওপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'Outlines of an Historical Grammar of the Bengali Language' বিশ্ব-বিত্থালয়ের একটি সভায় পঠিত হয় এবং বিশ্ববিত্থালয়ের 'Journal of the Depaıtment of Letters'-এ প্রকাশিত হয় (১৯২০)। তাঁর ঐ সময়ের 'Magdhi Prakrit and Bengali' নামে একটি প্রবন্ধ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিত্থা সম্মেলনে (All India Oriental Conference) প্রশংসা লাভ করে। 'Indian Historical Quarterly'-র ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পাটনায় অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনেব ষষ্ঠ অধিবেশনে তাঁর পঠিত 'Munda Affinities of Bengali' প্রবন্ধটি ভাষাতত্ত্বের ওপর নতুন আলোক পাত করে। পরে এই প্রবন্ধটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। "বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডাপ্রভাব" নামে একটি অধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' নামক তাঁর এক গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেছেন. "বাঙ্গালা ও মুণ্ডা ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা কেবল ঋণগ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় দেয়। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে ও তাহা অতিক্রম করিয়া আরো দূরবর্তী স্থানেও মুণ্ডাভাষাসমূহের প্রচলন দেখা যায়। পূর্বদিকে ব্যবহৃত খাসি ভাষার সহিতও মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আছে। আরো পূর্বদিকে পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইলে মোন্, খ্মার, পালোং, সেমাঙ, সাকাট ও নিকোবরী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়, মুণ্ডা ও খাসি ভাষার মতো এই সকল ভাষাও অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত। ইহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হয় যে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, তাহা এককালে অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজকে সরাইয়া দিয়া বা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিব্বত-বর্মী ও তাই ভাষাভাষী জনসমষ্টি স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বাঙলাদেশে এবং সম্ভবত

উত্তর ভারতের অন্যত্রও অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনসমাজ আর্যভাষীদের নিকট নিজেদের দখল ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার অস্ট্রিক ভাষীরা বাঙ্গালা ভাষায় কেবল তাহাদের বাক্‌ভঙ্গীর ছাপই রাখিয়া যায় নাই, ইহার শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে।" ভাষাতত্ত্বের ওপর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার ফলে ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষার গবেষণাসূত্রে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা দুজনেই পরস্পরের ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধের আলোচনা প্রত্যালোচনা করেছেন, কিন্তু বন্ধুত্বে ফাটল ধরে নি। যেমন সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২৪ সালের ৪র্থ সংখ্যায় ডঃ চট্টোপাধ্যায় 'আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধের এক জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা শহীদুল্লাহ্‌ পাঠ করেছিলেন। সুনীতিবাবু ঐ সমালোচনার উত্তরদানপ্রসঙ্গে প্রথমেই শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের পাণ্ডিত্যকে অভিনন্দন জানান, "তিনি সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং আরবী ও ফারসী ভাষাদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে; সুতরাং তিনি যে এক্ষেত্রে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ আনন্দের কথা।" শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবও অনুরূপভাবে তাঁকে সম্মান নিবেদন করেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ পাঠ করলে তা উপলব্ধি করা যায়।

শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব ভাষাতত্ত্বের গবেষণা ও আলোচনা Comparative, Historical ও Descriptive এই তিন ধারাতেই করেছেন। তুলনামূলক আলোচনা করতে ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার জন্য একাধিক ভাষা শিখেছেন, ইতিহাসভিত্তিক করতে গিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়েছেন। আর বর্ণনাভিত্তিক করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব (theory) গভীরভাবে রপ্ত করেছেন। এজন্যে তাঁর পক্ষে লুপ্ত শব্দাবলীর পুনর্গঠন ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় অত্যন্ত সহজ হয়েছে। এদিক দিয়ে তাঁর জুড়ি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

— তিনিও এই তিনধারায় ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৫৯) গ্রন্থে বাংলা ভাষার বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ কবেছেন। তিনি মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষার জন্ম 'গৌড়ী প্রাকৃত' ও 'গৌড়ী অপভ্রংশে' নির্দেশ করেছেন, "বাঙ্গালা ভাষার পূর্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাহাকে গৌড় অপভ্রংশ বলিতে পারি।·· কেহ কেহ অপভ্রংশ যুগের আরম্ভ ৬০০ খৃষ্টাব্দে মনে কবেন।···সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ এই যে বলভীরাজ গুহ সেন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগেব (৫৫৯-৬৯) এক অনুশাসনে সংস্কৃত, প্রাকৃত অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন। 'অপভ্রংশ' শব্দের ব্যবহার আমরা পতঞ্জলির (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) মহাভাষ্যে দেখিতে পাই।···গৌড় অপভ্রংশ হইতে সর্বপ্রথম মৈথিলী উৎপন্ন হইয়া পৃথক হইয়া যায়। তৎপরে উড়িয়া, তৎপবে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা। এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বাঙ্গালা ও আসামীতে পরিণত হইয়াছে।" তাঁর এই অভিমতের সঙ্গে সবাই একমত হবেন না, তবে চিন্তার খোবাক পাবেন। তাঁর মতে বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত ও মাগধ অপভ্রংশের থেকে উৎপন্ন হয় নি। 'মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা' অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীর যুক্তি খণ্ডন করেছেন। A. B. Keith 'A History of Sanskrit Literature" গ্রন্থে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মত সমর্থন করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ী ভাষাগুলিকে উদীচ্য শাখা, আওধী-বাসেলী-ছত্তিশগড়ী ভাষাকে প্রাচ্যশাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেব জর্জ গ্রীয়ারসনের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। তিনি পাহাড়ী ভাষাগুলিকে মধ্যদেশীয় শাখা আওধী-বাসেলী-ছত্তিশগড়ী ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে অপভ্রংশ যুগের সময় ৬০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে ৬৫০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় অনার্য, মুণ্ডা ও বৈদেশিক প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব,

কারক-বিভক্তির ইতিহাস, সর্বনাম, ক্রিয়া, কাল, বাক্যরীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর অনেক মতামত পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হয় নি, তথাপি এই আলোচনায় তাঁর স্বকীয়তা ও নিজস্ব গবেষণাপ্রসূত বহু দর্শনের অভিজ্ঞতা প্রতিপৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। শুনেছি 'The Origin and Development of Bengali Language'-এর নতুন সংস্করণে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনেক মত সুনীতি বাবু গ্রহণ করেছেন।

ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধও লিখেছেন। যেমন হৈহয় কুলের শার্যাত শাখা, প্রথম মহীপালদেব ও শ্রীয়ল, ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ, Gopala Deva I of Bengal, The Ancient People of Indus Valley, The First Aryan colonization of Ceylon, The Customs of Circumcision Among the Dravidians ইত্যাদি।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বর্ণনাভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ,' 'বানান ও বর্ণমালা সংস্কার'। বাঙ্গালা ব্যাকরণ তিনিই ১৯৩৫ সালে প্রথম রচনা করেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এর আগে যেসব ব্যাকরণ লেখা হয়েছে তা সবই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনের অনুকরণে, বাংলা ভাষায় নিজস্ব ব্যাকরণ পাওয়া যায় নি। এজন্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলেছিলেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ব্যাকরণ এবিষয়ে পথিকৃৎ এবং বহুলপ্রচারিত প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি 'ধ্বনি-প্রকরণ', 'শব্দ-প্রকরণ', 'বাক্য-প্রকরণ', 'ছন্দ-প্রকরণ' এই বিজ্ঞানভিত্তিক ভাগের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাকরণটির বর্তমানে ত্রয়োদশ সংস্করণ (১৩৬১) চলছে।

রবীন্দ্রনাথেরও ভাষার রহস্য উদ্ঘাটনে, উচ্চারণতত্ত্ব আবিষ্কারে প্রচুর উৎসাহ ছিল। এই সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেছেন,

"রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করেন।...তিনি স্বরসাম্যের নিয়মও আবিষ্কার করিয়াছেন।" (ভাষা ও সাহিত্য)। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পরিচয় ছিল। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সভাপতিত্বে 'ভারতের সাধারণ ভাষা' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন— প্রবন্ধটি তাঁর প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের পৌষ উৎসবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন।

বাংলা বানান সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কয়েকটি প্রবন্ধ (যেমন ১৩১৮ সালের কোহিনূর পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ', ১৩৩১ সালের প্রতিভা পত্রিকায় 'বাঙ্গালা বানান সমস্যা') দেশের ভাষাবিদ্‌দের ভাবিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথও এই নিয়ে ভেবেছেন। তিনি 'প্রবাসী'র ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' নামে এক আলোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঐ বছরের 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায় 'বাংলা বানান' নামে এক প্রবন্ধে কবিগুরুর উক্ত প্রবন্ধের বিশ্লেষণ করেন।

১৯৩৫ সালে রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার কমিটি গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ সাহেব 'প্রবাসী'র ১৩৪৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় এক মনোজ্ঞ সমালোচনা করেন। ঐ বানানবিধির কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে এবং কোন্ স্থলে যুক্তিকে বর্জন করে খেয়ালপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন। প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি বলেছেন, "বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত কিংবা ধ্বনিসঙ্গত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি বানান কিছু ব্যুৎপত্তিসঙ্গত, কিছু ধ্বনিসঙ্গত হয়, তবে তাহা খামখেয়ালি হইবে মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিয়ম হইবে না। উদাহরণ দিয়া বুঝাই— ইংরেজীতে knee, know, knife, knave ইত্যাদি শব্দে k উচ্চারিত হয় না। কিন্তু ব্যুৎপত্তির জন্য

প্রয়োজন আছে। ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বানানে k রাখা ঠিকই, কিন্তু যদি ধ্বনিসঙ্গত বানান চালাইতে হয় তবে k অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। এইরূপ folk, chalk, calf ইত্যাদি শব্দে l উচ্চারিত না হইলেও ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বানানে তাহা ব্যবহার করা কর্তব্য। ইংরেজীর ধ্বনিসঙ্গত বানান সংস্কার করিতে হইলে এই k, l সবই বাদ দিতে হয়। কিন্তু যদি কতকগুলি শব্দে এই অনুচ্চারিত বর্ণ রাখি আর কতকগুলিতে না রাখি, কিংবা কেবল k বর্জন করিয়া l রাখিয়া দিই বা l বর্জন করিয়া k রাখিয়া দিই, তবে বানানের ভয়ানক অনিয়ম হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মে সেই অনিয়মই ঘটিয়াছে।" তিনি নিয়মগুলির ত্রুটিবিচ্যুতির সঙ্গে নিয়ম কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কেও আলোচনার মধ্যে আলোক পাত করেছেন। পরে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বাংলা একাডেমির এক সভায় পঠিত প্রবন্ধ 'বাংলা লিপি ও বানান-সংস্কারে' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত বানানবিধির সমালোচনা করেন। বানান-সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করেন। এপ্রসঙ্গে তাঁর "আমাদের সমস্যা' গ্রন্থের 'বাংলা বানান ও অক্ষরসংস্কার', 'সোজা বাংলা', 'আরবী হরফে বাংলা ভাষা' প্রবন্ধগুলি পড়লে তাঁর পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের সঙ্গে সম্যক পরিচয় হতে পারে। এসব রচনায় তাঁর সরল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে আর যাঁর ব্যক্তিত্ব আছে style তাঁর থাকবেই, কারণ style is the man।

ভাষার প্রাণপ্রবাহ রয়েছে আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে। ম্যাক্সমূলার বলেছিলেন, 'The real and natural life of a language is in its dialects'। তাঁর সম্পাদিত পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান ও উর্দু অভিধান তাঁর মহত্তম কীর্তি। যদিও এগুলি বহুজনের সেবায় ও শ্রমে গঠিত, তবু তার নেতৃত্ব-দান আশী বছরের বৃদ্ধ শহীদুল্লাহ্‌র জ্ঞানপিপাসার অন্যতম স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আমাদের সমবেত দায়িত্ব তিনি একা বহন করেছেন, এই কথা স্মরণ করে তাঁকে সেই শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করি যে অর্ঘ্য তাঁব অবশ্য প্রাপ্য।

শহীদুল্লাহ্ সাহেব একাধিক ভাষা জানেন। ভাষা শেখার অর্থ হচ্ছে তাঁর কাছে অন্য দেশের লোকের মনের নিকটে পৌঁছে যাওয়া। মানুষের মনের দুয়ারে পৌঁছে তিনি নিজেই স্বার্থপরের মতো রসানন্দ উপভোগ করেন নি, অপরকেও সেই আনন্দেব অংশীদার করার জন্য বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের যখন যা তাঁব ভাল লেগেছে ক্লান্তিহীন উৎসাহে তার অনুবাদও বাংলাভাষায় করেছেন। বাংলায় আরবী থেকে "কুর্‌আন শরীফ" হযরত মুহম্মদের (দঃ) বাণীর অনুবাদ "অমিয়বাণী শতক" কুর্‌আন হাদীশের উপদেশাবলীব অনুবাদ "বাইঅত-নামা"—"কসীদতুলবুর্দ" "বানত-সুআদ" "বুখারী শরীফ" "কসীদাঃ গওসিয়া" ফারসী থেকে "দীওয়ান-ই-হাফিয" "রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম", উর্দু থেকে "শিক্‌ওআহ ওজওআব-ই-শিক্‌ওআহ্", মৈথিলী থেকে বিদ্যাপতির ১০০টি পদের পদ্যানুবাদ করেছেন। আবার চর্যা-গীতির ইংরাজী অনুবাদ Buddhist Mystic Songs, হযরত মুহম্মদের (দঃ) বাণীর ইংরাজী অনুবাদ "Hundred Sayings of the Holy Prophet" নামে তাঁর গ্রন্থ আছে। ফরাসী জার্মান থেকে কিছু খুচরো অনুবাদ তিনি করেছেন—গ্রন্থাকারে সেগুলি লিপিবদ্ধ হয় নি, পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন গ্যেটে রচিত "Mahomet's Gesang"-এর ইংরাজী অনুবাদ তিনি করেছিলেন যার সাহায্যে পরে কাজী আবদুল ওদুদ বাংলায় "মোহম্মদের গান" অনুবাদ করেন।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কুর্‌আনের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৬৬)। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে অনেকেই করেছেন (যেমন উইলিয়ম গোল্ডস্যাক, মৌলবী আব্বাস আলী, তসলিমউদ্দিন আহমদ, আবুলফজল আবদুলাহ্ করীম, আবদুর রহমান খাঁ, নকীবউদ্দিন খাঁ প্রভৃতি) কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনুবাদই অদ্যাবধি সর্বোৎকৃষ্ট—সম্প্রতি প্রকাশিত কাজী আবদুল

ওদুদ সাহেবের কুর্আনের অনুবাদ মনে রেখেও। ১৯৪০ সালে কুর্আনের আংশিক অনুবাদ "মহাবাণী" নামে প্রকাশিত হয়, পরে তিনি সম্পূর্ণ অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাধনায় তিনি সম্পূর্ণ কুর্আনের অনুবাদ সমাপ্ত করেন, কিছু অংশ 'জাগরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু গ্রন্থাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নি। সেই প্রকাশিত অংশে এবং "মহাবাণী" গ্রন্থে তিনি যেভাবে অনুবাদ ও সুরার বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন তার থেকেই মনে হয় কুর্আনের অনুবাদ তাঁর পূর্বে যাঁরা করেছেন এবং তাঁর সমকালে যাঁরা করছেন তাঁদের পড়াশুনার পরিধি তাঁর মত ব্যাপক ছিল না। তাঁর মত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অধিকারীও তাঁরা ছিলেন না। অনুবাদ করতে বসে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেক সময় মুক্ত হতে পারেন নি তাঁরা। নানা ধর্মের মর্মবাণীর সঙ্গে পরিচয় যেমন তাঁর নিবিড় ছিল তেমনটি আর কারুর ছিল না। আরবী ভাষার গভীরে প্রবেশ করে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপক পটভূমির ওপর ভিত্তি করে কুর্আন শরীফের অনুবাদ তিনি করেছেন। কাজেই গোঁড়ামি অনুদারতা সংকীর্ণতা ইত্যাদি থেকে তাঁর ভাষ্য ও ব্যাখ্যা মুক্ত। তিনি প্রথমে সুরার ভাবার্থ দিয়েছেন পরে অনুবাদ করেছেন, সুরাটি কোন্ সময়, কী কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল, তার নাম কেন এমন হ'ল সেটির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন এবং শেষে সুরার মধ্যে যে প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লেখ আছে তার বিস্তৃত টীকা রচনা করেছেন। এমন কি ভাষাগত আলোচনাও করেছেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে ঐ সুরার সাদৃশ্য কোথায় আছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। এভাবে কুর্আনের অনুবাদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্ণনায় তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন সেটি একাধারে নির্মোহ যুক্তির দীপ্তি ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দেয়, অন্যধারে তাঁর বিস্তীর্ণ অধ্যয়নের স্বাক্ষর বহন করে। ওদুদ সাহেবের অনুবাদ (পবিত্র কোর্আন, প্রথম খণ্ড, ভাদ্র ১৩৭৩, দ্বিতীয় খণ্ড, কার্তিক ১৩৭৪) সুরার শব্দগত অনুবাদ মাত্র। ইতিপূর্বে অন্যান্য অনুবাদকরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন ওদুদ

সাহেবের অনুবাদ সেই পদ্ধতির একটি বাড়তি উদাহরণ মাত্র অর্থাৎ মূলের পাশাপাশি অনুবাদ পর পর করে দেওয়া হয়েছে। ওদুদ সাহেব আরবীর মূল সুরা দেন নি, শুধু অনুবাদটি দিয়েছেন— বিস্তারিত 'নোট্স' না থাকার দরুণ অনুবাদ পড়ে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ হবে না বরং তাঁর ভূমিকা পড়ে মনে হ'ল তিনি ঐ জাতীয় ব্যাখ্যা প্রদানের বিরোধী। তিনি পাঠককে তাঁর "হযরত মোহম্মদ ও ইসলাম" (বৈশাখ ১৩৭৩) গ্রন্থটি "পবিত্র কোর্আনের" সঙ্গে পড়তে বলেছেন, কারণ তাঁর কাছে উক্ত দুটি গ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক কিন্তু পাঠক হিসেবে আমাদের বিবেচনায় সেটুকু যথেষ্ট নয়। তাঁর রচিত হযরত মুহম্মদের জীবনীগ্রন্থের মাধ্যমে কুর্আনের অনুবাদ পড়তে গিয়ে অনেক জায়গায় ঘটনার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এদিক দিয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনুবাদটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ একদিকে ইসলামের মূলবাণীর সঙ্গে যেমন নিবিড় পরিচয় গ্রহণে সহায়তা করে তেমনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা পাঠকের জিজ্ঞাসাকে অমেয় করে তোলে। পাঠকের অবগতির জন্য আমি উভয়ের অনুবাদের একটি অংশ পাশাপাশি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার কথাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে চাই। ওদুদ সাহেবের অনুবাদ—

আল্-ফাতিহাহ্

[আল্-ফাতিহাহ্ বা সুরাঃ ফাতেহা কোর্আন শরীফের প্রথম সুরাঃ, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ। এতে সাতটি আয়াত বা শ্লোক। ফাতিহাহ্-র অর্থ সূচনা। সুরাঃ ফাতেহা-র অনেকগুলো নাম, সে সবের মধ্যে খুব প্রচলিত হচ্ছে 'আল্-ফাতিহাহ্' 'ফাতিহাতুল্ কিতাব' অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থের সূচনা বা প্রারম্ভ, আর 'উম্মুল্ কোর্আন' কোর্আনের জননী বা কোর্আনের সার। এটি কোর্আনের সারই বটে, কেননা খুব সংক্ষেপে কোর্আনের মূল চিন্তা বা শিক্ষা এতে ব্যক্ত হয়েছে। এর একটি নাম 'সাব্উম্ মিনাল মাসানি' অর্থাৎ বার বার পঠিত সাতটি, তার কারণ, দৈনন্দিন নামাযে সেই সাতটি আয়াত বা শ্লোক বহুবার পঠিত হয়। যখন থেকে বিধিবদ্ধভাবে নামায পড়া শুরু হয়েছে তখন থেকেই এটি এইভাবে পঠিত হয়ে আসছে, কাজেই এটি

অবতীর্ণ হয়েছিল হযবতের প্রচাবক-জীবনের চতুর্থ বৎসরের পূবে এই ভাবা হয়।

হযরতের প্রচারক-জীবনের যে বারো বৎসর মক্কায় কেটেছিল তাকে চার সমান ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে: অতি-প্রাথমিক মক্কীয়, প্রাথমিক মক্কীয়, মধ্য মক্কীয়, অন্ত্য মক্কীয়।

এই স্থরায় আল্লাহ্‌কে বিশেষিত করা হয়েছে এইসব নামে: রব্, রহমান, বহীম, মালিক। কোর্‌আনেব মতে আল্লাহ্‌র আব সব প্রসিদ্ধ নাম বা বিশেষণ যা আছে তাব সঙ্গে আমবা পবে পবে পবিচিত হব। রব্-এর প্রধান অর্থ প্রভু, পালযিতা বা প্রতিপালক, সার্থকতা-দাতা— এব প্রতিশব্দ আমবা দিয়েছি পালয়িতা, প্রতিপালক, কচিৎ কখনো প্রভুও ব্যবহাব করেছি। বহ্‌মান-এর অর্থ দয়াময়— যিনি জগতেব ও জীবেব জন্য যা প্রয়োজনীয় পূর্ব থেকেই তাব ব্যবস্থা কবে বেখেছেন, এব প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি দয়াময়, করুণাময়। বহীম্-এব অর্থও দয়াময়, তবে সেই সঙ্গে বোঝায় তাঁব পুরস্কার-দাতাব রূপ— মানুষের শুভ চেষ্টার বহু পুরস্কার তিনি দেন, বহুভাবে তাকে সার্থক করেন। তার প্রতিশব্দ আমরা দিয়েছি কৃপাময়, ফলদাতা, প্রতিপালক। মালিক শব্দের প্রতিশব্দ আমবা দিয়েছি প্রভু— যাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব বয়েছে, যিনি শাস্তি দিতে পাবেন, ক্ষমাও কবতে পারেন।]

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ্‌ব নামে

১. (সমস্ত) প্রশংসা আল্লাহ্‌ব উদ্দেশ্যে (যিনি) বিশ্বজগতেব পালয়িতা—

২. করুণাময়— ফলদাতা—

৩. বিচাবেব দিনেব প্রভু।

৪. তোমাবই বন্দনা আমবা করি, আর তোমাবই কাছে সাহায্য চাই।

৫. আমাদের সরল পথে চাল.ও—

৬. তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ,

৭. তাদের পথে নয় যাবা তোমার রোষেব পাত্র, তাদের পথেও নয় যাবা পথহারা।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনুবাদ—

স্থরাঃ ফাতিহা [১]

[মক্কায় অবতীর্ণ : ৭ বচন : ১ অনুচ্ছেদ : ২৭ শব্দ : ১২২ অক্ষর]

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহের নামে আরম্ভ [২]

১. সকল প্রশংসা আল্লাহের যোগ্য, (যিনি) প্রতিপালক প্রভু (রব্ব) [৩] সমস্ত জগতের [৪]।

২. পরম দয়ালু [৫] দয়াময় [৬]।

৩. মালিক (শেষ) বিচার-দিনের [৭]।

৪. কেবল তোমারই আমরা আরাধনা (ইবাদত) করি [৮] এবং তোমারই কাছে আমরা সাহায্য চাই [৯]।

৫. চালাও [১০] আমাদিগকে সোজা পথে [১১]।

৬. তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ (নিআমত) দান করিয়াছ [১২]।

৭. যাহারা নয় ক্রোধ (গর্ব) গ্রস্ত [১৩] কিংবা নয় পথভ্রান্ত [১৪]।

আমীন [১৫]

সূরাঃ ফাতিহার ভাবার্থ

আল্লাহ্ বিশ্বভুবনের সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং উপদেষ্টা। তিনি পরম দয়ালু, দয়াময়। তাঁহার রাজ্যে পাপী ও অত্যাচারীর সুখ, অন্যপক্ষে ধার্মিক ও সদাচারীর দুঃখ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাই তিনি পার্থিব জীবনান্তে পরলোকে সকলের সুবিচার করিবেন। সেখানে তিনিই একমাত্র প্রভু ও কর্তা। অতএব সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সর্ব অবস্থায় সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য উপযুক্ত। হে অশেষ গুণবান্ আল্লাহ্, তোমার ন্যায় গুণসম্পন্ন এই ত্রিলোকে আর ত কেহই নাই। তাই একমাত্র তুমিই সকলের উপাস্য এবং তুমিই সকলের সহায়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি কেবল তোমারই দাসত্ব ও আরাধনা করিব এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য চাহিব। প্রভু, আমি তোমার এই সাহায্য চাই যে, তুমি আমাকে তোমারই পথে চালাইবে, যেমন কোনও দয়ালু ব্যক্তি অন্ধকে হাত ধরিয়া তাহার গন্তব্য পথে লইয়া চলে, তেমন ভাবে চালাইবে।

হে পরম-প্রিয়, আমি ধন, জন বা সুখ-সম্পদ লাভের জন্য তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি না। আমি তোমার নিকট তোমাকেই যাচ্ঞা করিতেছি। যে পথে তোমার অনুগৃহীত জনেরা যুগে যুগে

চলিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছে, সেই পথ তুমি আমাকে দেখাইয়াছ সত্য, কিন্তু আমি হীনমতি, ক্ষীণগতি। তাই আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি যেন আমি সেই পথে চলিতে চলিতে বারংবার তোমার নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া তোমার প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত না হই কিংবা সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত দুঃখ-পারাবারে নিমগ্ন না হই।

টীকা

১. কুর্‌আনের অধ্যায়কে সুবাঃ বলা হয়। এই প্রথম অধ্যায়কে সুরাঃ ফাতিহাঃ বা উন্মোচনকারী অধ্যায় বলা হইয়াছে। ইহা সমস্ত কুর্‌আনের উপক্রমণিকা, এই জন্য ইহাব ২৫টি নামেব একটি নাম "উম্মুল কুব্‌আন" কুর্‌আনের জননী বা মূল। কতক বিদ্বানেব মতে ইহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ অধ্যায়। সাধারণের মতে ইহা সুবাঃ মুদ্দাসিবেব পবে অবতীর্ণ। বাস্তবিক ইহা একটি সার্বজনীন প্রার্থনা।

২. এই বাক্য নবম অধ্যায় ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়েব পুর্বে লিখিত আছে। ইমাম (ধর্মাচার্য)-গণের মধ্যে ইহা কোনও অধ্যায়েব প্রথম বচন (আয়ত) কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা যে আল্লাহ্‌ কর্তৃক অবতীর্ণ কুর্‌আনের একটি বচন, তাহাতে সকলে এক মত। ইহা সুরাঃ নমলের (২৭ অধ্যায়েব ৩০ বচনে) হযরত সুলায়মানেব (আঃ) পত্রেব আরম্ভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা কুর্‌আনের পুর্বতন ধর্মপুস্তকেব বচন, যাহা কুর্‌আনে পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কুর্‌আন পাঠের পুর্বে এই বচন পাঠের ইঙ্গিত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ বলিয়া বিখ্যাত কুর্‌আনেব বচনেই পাওয়া যায়। "পড় তোমার সেই প্রতিপালক প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন (৯৬।১)।" এই শুভ বচন প্রত্যেক শুভকার্যের পুর্বে পাঠ করা রসূলুল্লাহের (দঃ) বিধান (সুন্নত)।

৩. আরবী রব্ব শব্দেব আভিধানিক অর্থ প্রতিপালক, প্রভু, সংস্কারক। "রব্বি রহমহুমা কমা রব্বয়ানী সগীরা (১৭।২৪)— হে আমাব প্রতিপালক প্রভু তাহাদের (পিতা-মাতার) প্রতি দয়া কব, যেমন তাহাবা আমাকে বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়াছেন," এই বচনে রব্ব শব্দের পারিভাষিক এবং আভিধানিক দুই অর্থ-ই ব্যক্ত হইয়াছে। কেবল রব্ব শব্দ আল্লাহের প্রতি ব্যবহৃত হয়, যেমন "রব্বী" হে আমার প্রভু "রব্বানা" হে আমাদের প্রভু। প্রভু মুহম্মদ, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রভৃতি প্রয়োগ কুর্‌আন মতে নিষিদ্ধ।

৪. মূলে "আলমীন" শব্দের অর্থ সমস্ত সৃষ্টি, যেমন জীবজগৎ, জগৎ, জড়জগৎ প্রভৃতি।

৫. মূলে "আর্‌রহীম"। ইহা দ্বারা পরলোকে ধার্মিক ও অনুতপ্ত পাপীর প্রতি তাঁহার দয়া বুঝায়। তিনি কেবল পরমদয়ালু দয়াময় নহেন, তিনি কঠোর ন্যায় বিচারক, ইহা পরবর্তী বচনে প্রকাশ করা হইয়াছে।

৬. মূল "আর্‌রহমান"। ইহা কেবল আল্লাহের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা ধার্মিক-অধার্মিক, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, চেতন-অচেতন সকলের প্রতি ইহলোকে তাঁহার দয়াবর্ত প্রকাশিত হয়। আল্লাহের এই নাম আমাদিগকে সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেয়। রসূলুল্লাহের উক্তি "ভূলোকে সকলের প্রতি দয়া কর, তাহা হইলে যিনি দ্যুলোকে আছেন তিনি তোমাদিগকে দয়া করিবেন।" (আবু দাউদ এবং তিরমিযী) আরবী ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাহার বিপরীত। "আর্‌রহমান যদিও বিশেষণ কিন্তু আল্লাহের প্রতিশব্দরূপে বিশেষ্য স্থানীয়। এই জন্য অনুবাদে পরে বসান হইয়াছে।

৭. মূলে "য়উমিদ্দীন্"। "য়উম" (দিবস) শব্দ দ্বারা ২৪ ঘণ্টার দিন বুঝায় না। ইহা দ্বারা নির্দিষ্ট কাল বুঝায়। যেমন কুর্‌আনে উক্ত হইয়াছে "সেই দিন যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর" (৭০।৪) পুনরুত্থানের পর পরলোকে মহা-বিচার-দিনের কথা এই বচনে বলা হইয়াছে। এই বিচারান্তে স্বর্গ বা নরকভোগ। কুর্‌আন শরীফের বহুস্থানে এই বিচার-দিনের বর্ণনা আছে। যথা "আর কিসে তোমাকে বুঝাইবে সেই বিচার-দিন কি? অনন্তর, কিসে তোমাকে বুঝাইবে সেই বিচার-দিন কি? যেদিন কোন জীবাত্মা কোনও জীবাত্মার বিষয়ে কোনও ক্ষমতা রাখিবে না সেই দিন সকল আদেশ কেবল আল্লাহের হইবে।" (৮২।২৭।৯) পূর্বের বচনে আল্লাহের শান্তগুণের (জমাল) উল্লেখ হইয়াছে। এই বচনে তাঁহার রৌদ্রগুণের (জালাল) কথা বলা হইয়াছে। একত্র এইরূপ রৌদ্র ও শান্তভাবের সন্নিবেশ কুর্‌আনের এক চমৎকারিত্ব। "সংবাদ দাও আমার দাসগণকে এই যে আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর এই যে আমার শাস্তি তাহা কষ্ট-দায়ক শাস্তি।" (১৫।৪৯)

৮. আরবী "না' বুদু"। ইহার এক অর্থ আমরা আরাধনা করি। অন্য অর্থ আমরা দাসত্ব করি। ইহার বিশেষ্যপদ ইবাদত, অর্থ আরাধনা, দাসত্ব। মানুষ যেমন একমাত্র আল্লাহেরই উপাসনা করিবে সেইরূপ একমাত্র তাঁহারই দাসত্ব

করিবে। উক্ত হইয়াছে "আমার আরাধনা (ইবাদত্) করিবে কেবল এইজন্য আমি দানব (জিন) ও মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি।" (৫১।৫১) মানুষ কেবল আল্লাহের দাস (আবদুল্লাহ্) আর কাহারও দাস নহে। কোন মানুষ অন্য কোনও মানুষের, কোনও শক্তির, কোনও পীর পয়গাম্বর বা দেবতার দাসত্ব করিবে না। এই বচনে এই অঙ্গীকার করা হইয়াছে। দাসত্বের অর্থ ন্যায় ও বিবেকের বিরুদ্ধে বা আল্লাহের আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও আদেশ পালন করিতে কিংবা নিজের ধনপ্রাণ কাহারও সেবায় উৎসর্গ করিতে বাধ্য থাকা।

৯. ইহার মর্ম এই যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও মৃত পীর বা পয়গাম্বর কিংবা জিন, ভূত, প্রেত, দেবতার নিকট মানুষ সাহায্য প্রার্থনা করিবে না।

উক্ত হইয়াছে "তাঁহাকে ডাকা ঠিক, আর যাহারা তাঁহাকে ছাড়া অন্যকে ডাকে তাহারা কিছুমাত্র তাহাদের জবাব দেয় না। ইহা শুধু যেন কেহ তাহার দুই করতল পানির দিকে বাড়ায়, যাহাতে পানি তাহার মুখ পৌঁছায়, কিন্তু তাহা মুখে পৌঁছাইবার নয়। অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়।" ইহার অর্থ এই নয় যে পীড়া, দুঃখ বা বিপদে আপদে কোনও জীবিত লোকের সাহায্য না লইয়া কেবল আল্লাহের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিব। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিব যে একমাত্র আল্লাহ্ তা-আলাই আরোগ্য-দাতা, সুখ-বিধাতা, বিপদ-হন্তা, সব মঙ্গল-বিধান সর্বশক্তিমান, নিরাপদ-কর্তা, জীবিকা-দাতা। তবে তাঁহারই বিধান অনুযায়ী অন্যের নিকট সাহায্য চাহিবে।

বলা হইয়াছে "ধৈর্য ও উপাসনা (সলাত) যোগে সাহায্য চাও।" (২।৪৫) তদ্‌বীর এই ধৈর্যের অন্তর্গত। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কিংবা কেবল আল্লাহের নিকট প্রার্থনা করিয়া কার্যবিমুখ হইয়া বসিয়া থাকা ইসলাম-বিরুদ্ধ। রসূলুল্লাহের (দঃ) উক্তি, "উটকে বাঁধ এবং আল্লাহের উপর ভরসা কর।" (তিরমিযী)

১০. মূলে "ইহ্‌দি"। ইহার বিশেষ্যপদ "হিদায়াত" "হুদা"। ইহার এক অর্থ পথ দেখান, অপর অর্থে পথে চালিত করা। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থ। আল্লাহ পথ দেখান, সকলের জন্য। "তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাঁহার আকৃতি দান করিয়াছেন। অনন্তর তাহাকে পথ দেখাইয়াছেন।" (২০।৫০) কিন্তু সুপথে চালিত করা তাঁহার বিশেষ দয়া সেই ব্যক্তির জন্য যে তাঁহার প্রতি উন্মুখ হয়। "আল্লাহ্ যাহাকে চান নিজের জন্য বাছিয়া লন এবং যে তাঁহার দিকে উন্মুখ হয় তাহাকে তিনি সুপথে চালিত করেন।" (৪২।১৩)

১১. সোজাপথ যে পথে আল্লাহের সন্তোষ লাভ হয়, যে পথে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়। "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রভু সোজা পথে অবস্থিত।" (১১।৫৬) এই পথ যে কোনও নতুন পথ নয়, কিন্তু আল্লাহেব অনুগৃহীত সমস্ত প্রাচীন সাধু-সজ্জনের পথ, তাহার পরেব বচনে বলা হইয়াছে। এই পথ পাইতে হইলে কি করা প্রয়োজন ? "অনন্তর যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস বাখে এবং তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে শীঘ্র তিনি তাহাদিগকে নিজেব দয়া ও অতিরিক্ত অনুগ্রহে প্রবেশ করাইবেন এবং নিজের দিকে সোজা পথে চালিত কবিবেন।" (৪।১৭৬)

১২. ইহাদেব বিষয় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং রসূলের (প্রেরিত পুরুষেব) কথা মানে, অনন্তর তাহারা নবী (ভাববাদী) সিদ্দীক (সত্যব্রত) শহীদ (ধর্মেব সাক্ষী-স্বরূপ প্রাণোৎসর্গকাবী) এবং ওলিহ (সাধু) -গণ যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ দান কবিয়াছেন, তাহাদেব সহিত হইবে এবং তাহারা সঙ্গী হিসাবে উত্তম।" (৪।৬৯) কাদিয়ানীগণ এই বচন হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে এই প্রার্থনা অনুযায়ী কেহ কেহ নিশ্চয়ই নবী হইবেন। কিন্তু এখানে পূর্ববর্তী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণেব পথেব কথা বলা হইয়াছে, অন্য বিষয় বলা বলা হয় নাই। অবশ্য হযরত মুহম্মদ (দঃ) নবী হইয়াছেন। তাঁহার পরে যে কোনও নবী জন্মিবেন না তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে।

১৩. এই সপ্তম বচন পূর্বের বচনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ধনী, জ্ঞানী, মানী, রাজা, মহারাজা ইহারাও আল্লাহের অনুগৃহীত। কিন্তু তাহাদের কেহ নাস্তিক কেহ অধার্মিক কেহ বা পাপাচারী। তাহাদের পথে যেন আমরা না চলি। যাহারা নাস্তিক কিংবা আল্লাহের গুরুত্বপূর্ণ আদেশ স্বেচ্ছায় অমান্যকারী কিংবা ঘোর পাপাচারী, তাহারা ক্রোধে পতিত (মাগদুব)।

১৪. আরবীতে "দাল্লীন"। ইহার এক অর্থ যাহারা স্বেচ্ছায় সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হয়, অন্য অর্থে যাহারা বিলকুল পথপ্রাপ্ত হয় নাই। এই দুইয়েরই কুপথ আমাদের গন্তব্য নয়।

১৫. এই বাক্য কুর্‌আনে লিখিত হয় না। ইহা অধ্যায় পাঠের পর বলা রসূলুল্লাহের সুন্নাত (পদ্ধতি)। ইহার অর্থ ইহা এইরূপ হউক। ইহা স্বস্তি-বচনের তুল্য। ইমামগণের মধ্যে কেহ উচ্চস্বরে কেহ চুপে চুপে পড়িবার বিধান দেন। তওরাত (Old Testament) যবুর (Psalms) এবং ইঞ্জিলে (New Testament) এই বচন (amen) দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাও পূর্বতন ধর্ম-পদ্ধতি।

বিবি আয়েশা বলেছিলেন, "কুর্‌আন হচ্ছে হযরতের চরিত্র"—তাঁর এই উক্তি শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব কুর্‌আনের অনুবাদের মাধ্যমে আরবী-অজানা বাঙালী পাঠকদের সামনে অধিকতর পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর "অমিয়বাণী শতক" "শেষ নবীর সন্ধানে" ও "ইসলাম প্রসঙ্গ" গ্রন্থগুলির কথা বলতে হয়। "অমিয়বাণী শতকে" হযরত মুহম্মদের (দঃ) ১০০টি বাণীর অনুবাদ রয়েছে। "শেষ নবীর সন্ধানে" তিনি হযরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভাব ও মক্কাজীবনের বিভিন্ন ঘটনার ওপর গবেষণামূলক আলোকপাত করেছেন। "ইসলাম প্রসঙ্গ" গ্রন্থে তিনি বর্তমান আলোকে ইসলাম ধর্ম ও ধর্মগুরুর জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন যুগে মুসলিম সাধকদের মত ও পথের তুলনামূলক আলোচনা কবেছেন। উভয় গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে কুর্‌আন হাদীশের প্রচুর উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিখ্যাত হাদীশ গ্রন্থ "বুখারী শরীফ" তিনি অনুবাদ করেছেন। তাই কুর্‌আনের অনুবাদের সঙ্গে ঐ গ্রন্থগুলি পাঠ করলে তুলনামূলক ধর্ম-তত্ত্বে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। "হজ্জের ওরওযাঃ পাকের যিয়ারাতের দো 'আ দরূদ" "রোযাহ্‌, ঈদ ও ফিতরাঃ" গ্রন্থে ইসলামী ক্রিয়াকাণ্ডেব মননসমৃদ্ধ আলোচনা আছে। বাংলা ভাষায় ইসলামকে চেনার পক্ষে এগুলিও অদ্বিতীয় বই।

শাস্ত্রজিজ্ঞাসা তাঁর রসপিপাসাকে কোনদিন ক্ষুণ্ণ করে নি। তার অন্যতর দৃষ্টান্ত বিভিন্ন স্বাদের গ্রন্থের সুন্দর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। হাফিযের গযল ও উমর খয়্যামের রুবাই অনুবাদেও তাঁর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। হাফিয শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রিয় কবি। স্কুলজীবন থেকেই তিনি তাঁর অনুরক্ত পাঠক। তিনি বলেছেন, "স্কুলজীবনে হাফিয আমার প্রিয় কবি ছিলেন। তখন কিন্তু ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের হাফিযের গদ্যানুবাদ ছাড়া মূল ফারসী আমার পড়া হয় নি। আমি ঐ গদ্যানুবাদ থেকে হাফিযের একটা গযলের পদ্যানুবাদ করেছিলাম।...হাফিযের সুরা যে ঈশ্বর-প্রেমের সুরা তা গিরিশবাবুর টীকা থেকে বুঝেছিলাম।"

(আমার সাহিত্যিক জীবন)। পরে তিনি ফারসী থেকে হাফিযের মূল ছন্দে গযলের অনুবাদ করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁর "দীওয়ান-ই-হাফিয" অনুবাদগ্রন্থ বেরোয়। এই গ্রন্থে হাফিযের ৬০টি গযলের মূল ছন্দে অনুবাদ তিনি করেছেন। অনুবাদের পাশাপাশি মূল ফারসী গযল দিয়েছেন যাতে ফারসী জানা কিংবা অজানা পাঠকদের কোন অসুবিধা না হয়। পাঠক যাতে মূলের পাশাপাশি আনুগত্য লক্ষ্য করতে পারে সেদিকে তিনি যত্নবান হয়েছেন। কেন জানি না বর্তমান সংস্করণে (১৯৫৯) প্রকাশক মূল ফারসী বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদটি প্রকাশ করেছেন। মূলসহ হাফিযের গযলের অনুবাদ একটি দিলাম—

: মত্‌রিব-ই-খোশ্‌ নওআ বো-গ্‌ তাযাঃ ব তাযাঃ নও ব-নও।
বাদাঃ-ই-দিলকুশা বো-জু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও॥
ব-সনমে চু লু'বতে খোশ্‌ বি-নিশী ব-খিল্‌ওতে।
বোসাঃ সিতাঁ ব-কাম্‌ আযু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও॥
সাকী-ই-সীমসাক-ই-মন্‌ মস্ত্‌ নয়ম্‌ বি-য়ারমশ্‌।
যুদ্‌ কেঃ পুর্‌ কুনম্‌ সবু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও॥
বর্‌ যে হয়াত কয়্‌ খোরী গর্‌ নঃ মুদাম ময়্‌ খোরী।
বাদাঃ বো-খোর ব-য়াদ-ই-উ তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও॥
শাহিদ-ই-দিল-রুবা-ই-মন্‌ মী কুনদ্‌ আয বরাএ মন্‌।
নক্‌শ নিগার ও রঙ্গ ও বূ তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও॥
বাদ-ই-সবা চু বু-গ্‌যরী বর্‌ সর্‌-ই-কূ-ই-আঁ পরী।
কিসসাঃ ই-হাফিযশ্‌ বো-গূ তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও॥

তাজা তাজা

গাও হে গায়ক !	মধুর সুতান	তাজা তাজা	নিতুই নূতন।
লাও পেয়ালা,	খুলুক পরাণ	তাজা তাজা	নিতুই নূতন।
পুতুল-পারা	প্রিয়া সাথে	ব'সে সুখে	নিরালাতে,
প্রাণ ভরে নে	তার চুম্‌দান	তাজা তাজা	নিতুই নূতন।
রূপার বরণ	সাকী আমার !	ঢাল' শরাব,	নেশা নাই আর
ভরুব পাত্র	কাণা প্রমাণ	তাজা তাজা	নিতুই নূতন।

মূর্খ রে! তোর   বেঁচে কি কাম,   শরাব যদি   করলি হারাম?
তার খেয়ালে   শীরাযী টান্   তাজা তাজা   নিতুই নূতন।
মন চোরা মোর   প্রিয়া যে ভাই!   আমার তরে   করে সদাই,
বেশ ভূষা রঙ্   সাজ কত খান,   তাজা তাজা   নিতুই নূতন।
বও যদি ধীর   প্রভাত সমীর!   গলি দিয়ে   সেই পরীটির,
শুনিয়ো তাবে   হাফিযী গান   তাজা তাজা   নিতুই নূতন।

নজরুল ইসলাম এই গযলের ভাবানুবাদ করেছিলেন। "নজরুল গীতিকা"য় সেটি পাওয়া যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও এই গযলের অনুবাদ করেছিলেন "তাজা ব-তাজা" নামে, কিন্তু তাঁর অনুবাদ ইংরেজী থেকে, কাজেই মূলানুগ হয় নি, মূল ছন্দের বিচ্যুতিও ঘটেছে। ১৯৪২ সালে "রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম" বেরোয়। এ গ্রন্থেও তিনি মূল ছন্দে ১৫১টি রুবাইয়ের অনুবাদ করেন। এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হাফিয ও উমর খয়্যামের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি মূলভাষাব অনুবাদ নয়। সবাই ইংরেজী অনুবাদ, বিশেষ করে উমর খয়্যামের ক্ষেত্রে ফিটজারেল্ডের অনুবাদ থেকেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম ও শহীদুল্লাহ্ সাহেব মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মতে "অনুবাদ হইবে মূলের প্রতিচ্ছবি। তবে ছন্দের অনুরোধে যথাসম্ভব সামান্য বাচনিক পরিবর্তন অপরিহার্য হইতে পারে। কিন্তু মূলের ভাবের পরিবর্তন আমি দূষণীয় মনে করি।" (মুখবন্ধ ঃ দীওয়ান-ই-হাফিয)। বিদ্যাপতির ১০০টি পদের অনুবাদ "বিদ্যাপতি শতক" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধে'ও তিনি বলেছেন "আমি পদাবলীর ছন্দ অনুকরণ করিয়া পদ্যানুবাদ দিয়াছি। জানি না ইহাতে আমি 'গমিষ্যাম্যুপ-হাস্যতাং' কি না। তবে ভরসা 'মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।' যতদূর সম্ভব আমি বিদ্যাপতির খাঁটি পদ ও পদের ভাষা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি।" মূল পদ সহ তাঁর অনুবাদের একটি নমুনা দিলুম—

ঃ কাননে কাননে কুন্দ ফুল
পলটি পলটি তাহে ভমর ভুল ॥২

পুনমতি তরুনি পিয়া সঙ্গ পাব
বরিসে বরিসে ঋতুরাজ আব ॥৪
রঅনি ছোটি হো দিবস বাঢ।
জনি কামদেব করবাল কাঁঢ ॥৬
মলয়ানিল পিব জুবতি মান।
বিরহিনি বেদন কেও ন জান ॥৮
ভনে বিদ্যাপতি রিতু বসন্ত।
কুমর অমর জ্ঞানো দেই কন্ত ॥১০

কাননে কাননে ফোটে কুন্দ ফুল,
ঘুরে ফিরে আসে ভোলা অলিকুল।
পুণ্যবতী বামা পায় প্রিয় কান্ত,
বরষে বরষে আগত বসন্ত।
দিন বাড়ে ক্রমে, ছোট হয় নিশি,
যেন কামদেব খুলিয়াছে অসি।
মলয় বিনাশে যুবতীর মান,
বিরহিণী-ব্যথা কাহার অজ্ঞান ?
ভণে বিদ্যাপতি এ ঋতু বসন্ত,
কুমার অমর জ্ঞানোদেবী-কান্ত। (৭৭ সংখ্যক অনুবাদ)

ইকবালের "শিক্‌ওআহ্‌" ও "জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়াহ্‌"র অনুবাদ তিনি সাড়ে পাঁচ দিনে সমাপ্ত করেছিলেন। এই অনুবাদও মূলের অবিকল কাঠামো রক্ষা করে অনূদিত হয়েছে এবং অনুবাদের পাশা-পাশি বাংলা অক্ষরে মূল উর্দুর অনুলিখন দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠকরা অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে কিনা স্বচ্ছন্দে বিচার করতে পারেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমি মনে করি, প্রথমতঃ, অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলের ছবি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পদ্যানুবাদে মূলের কাঠাম বজায় রাখিতে হইবে ; যথা সনেটের অনুবাদে চতুর্দশ-পদী ; গযলের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ও যতদূর সম্ভব অন্ত্য মিল (কাফিয়াহ্‌) এবং যমক (রদীফ) ; এইরূপ রুবাইয়াতের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ৪, অন্ত্য মিল ও যতদূর সম্ভব যমক রক্ষা করিতে হইবে।

শিক্ওয়াহ্ ও জওআব-ই-শিক্ওআহ্ মুসদ্দস অর্থাৎ ছয় চরণ বিশিষ্ট। ইহার প্রথম চাবি চরণে এক মিল এবং শেষ দুই চরণে অন্য এক মিল। কখনও মিলের পরে যমক থাকে। সাধারণ উর্দু কবিতার ন্যায় ইহা আরবী ছন্দে রচিত। ইহাতে ছন্দ হ্রস্ব, দীর্ঘ অক্ষর ও পদ-সংখ্যার উপর নির্ভর করে।" (নূতন সংস্করণেব ভূমিকা : বৈশাখ ১৩৭১) তাঁর অনুবাদেব একটি স্তবক নীচে দেওয়া হল—

: হায়্ বজা শেওআএ তস্লীম মেঁ মশ্হুর হাঁয়্ হম,
কিস্সাএ দর্দ সুনাতে হাঁয়্ কে মজ্বুর হাঁয়্ হম,
সাযে খামোশ হাঁয়্, ফরিয়াদ সে মা 'মুর হাঁয়্ হম,
নালাহ্ আতা হায়্ আগর লব পে, তো মা 'যুর হাঁয়্ হম।
আয় খুদা। শিকওআএ আব্বাবে ওফা ভী সুন্ লে,
খুগরে হম্দ সে থোড়া সা গিলা ভী সুন লে।

তোমার সেবক ব'লে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে,
দুখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধ্য হ'লাম আজকে সবে।
চুপ যদিও বীণার মত কাঁদছে পরাণ করুণ রবে।
বিলাপ যদি বেরোয় ঠোঁটে, নাচার ব'লে ক্ষ'মো তবে।
নালিশ আজি করছে খোদা। তোমার ভক্ত বান্দা, শোন,
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদেব নিন্দা শোন।

ইকবালের এই কাব্যগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ একাধিক রয়েছে। প্রথম অনুবাদ করেন আশবাফ আলী খান। তারপর আব যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন গোলাম মোস্তাফা, কাজী আকরাম হোসেন, আমীনউদ্দীন আহমদ, মীজানুর রহমান, তমিজর রহমান ইত্যাদি। কিন্তু এই অনুবাদগুলিব মধ্যে আশরাফ আলী খান ও গোলাম মোস্তাফা সাহেবেব অনুবাদ স্বচ্ছন্দ হয়েছে কিন্তু মূল ছন্দ তাঁরা সর্বত্র কঠোরভাবে মেনে চলেন নি। শহীদুল্লাহ্ সাহেব কবিত্বের রাশ আলগা করেন নি। কবিতা হোক বা না হোক মূলভাব ও ছন্দ যেন ঠিক থাকে। অনুবাদ করতে গেলে শুধু কবিত্ব নয় পাণ্ডিত্যেরও প্রয়োজন, কেন না ঐ ভাষার সঙ্গে গভীর ও অন্তরঙ্গ

পরিচয় না থাকলে সেই ভাষার অবিকল মূর্তিটি অনুবাদে ধরা পড়ে না। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের যে পরিমাণে পাণ্ডিত্য ছিল সে-পরিমাণে কবিত্ব ছিল না। সেজন্য তাঁর অনুবাদ যে-পরিমাণ 'faithful' হয়েছে সে-পরিমাণে beautiful হয় নি। তবে প্রতিটি অনুবাদ-গ্রন্থের সঙ্গে কবিদের পরিচয়, ছন্দ ও ব্যাকরণ আলোচনা যে ভাবে দিয়েছেন সেরকম ভূমিকা রচনা আর কেউ করেন নি। বিশেষ করে হাফিয, উমর খয়্যাম, বিদ্যাপতির বিস্তৃত জীবনী ও কবি-পরিচয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'শিক্ওআহ্' অনুবাদের শেষে কবি-পরিচিতি দিয়েছেন এবং কবি সম্পর্কে পৃথকভাবে এক মনোজ্ঞ আলোচনা গ্রন্থও লিখেছেন। বাংলা ভাষায় ইকবালের ওপর আলোচনা অত্যন্ত অল্প। যদ্দূর মনে পড়ে কাজী আবদুল ওদুদ ছাড়া ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এধারের বাঙলায় ইকবাল সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছিলেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' বলেছেন, "আমি এই পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে হইলেও পূর্ণভাবে আলোচনার প্রয়াস করিয়াছি।" তাই তাঁর ৯০ পৃষ্ঠার চটি বই ইকবাল-সাহিত্যে প্রবেশ করার এক নির্ভরযোগ্য চাবিকাঠি।

ভক্তিবাদীদের মধ্যে একটি গান আছে। সেই গানের দুটি লাইন—

: মা আমারে দয়া ক'বে শিশুর মত ক'রে রেখো,
বয়স বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই, মনটি আমার শিশু রেখো।

বর্তমান গ্লানিকর পরিবেশের মধ্যে যেখানে মানুষ সামান্য বিষয় নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে সেখানে বয়স বাড়বে অথচ মন থাকবে শিশুর মতো তার উদাহরণ চাইলে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নাম করা যেতে পারে। তাঁর বয়স বেড়েছে, যশ মান পাণ্ডিত্য প্রচুর হয়েছে, কিন্তু তিনি শিশুর মত নির্লিপ্ত। পাণ্ডিত্য ও সৃষ্টির আভিজাত্য সম্পর্কে তিনি মোটেই সচেতন নন, আলাপ-আলোচনায় শিশুর সারল্য নিয়ে সবার সঙ্গে মিশেছেন। সে-যুগে শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানরা অনগ্রসর ছিলেন। তিনি অগ্রণী হয়ে শিশু-মানস গঠনের কথা ভেবেছিলেন। ছেলেদের ভাল-বাসতেন বলে সাহিত্যেও ছোটদের তিনি বঞ্চিত করেন নি। শিশু-চিত্ত বিকাশের জন্য তিনি "আঙ্গুর" নামে এক সচিত্র মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। এই পত্রিকায় একদিকে দেশী-বিদেশী রূপকথা উপকথা অপরদিকে রামায়ণ-মহাভারত, কুর্‌আন-হাদীশ, গুলিস্তাঁ-বোস্তাঁ থেকে ছোটদের উপযোগী গল্প লিখেছেন। পত্রিকাটি বছর খানেক মাত্র চলেছিল, কিন্তু শিশুদের তিনি ভোলেন নি। Peace পত্রিকা সম্পাদনার সময়েও ছোটদের জন্য নবীকাহিনী লিখেছিলেন—

January 1930	:	Adam and Eve
March	:	Abel and Cain
April	:	Noah, the Prophet of Allah
May	:	Hood and his people
June	:	Salih and his people
August	:	Loqman, the wise.

বাল্যকাল থেকে তারা যাতে আদর্শ চরিত্রবান হয়ে ওঠে সেজন্যে প্রচুর

স্কুলপাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। ঐ সব পাঠ্যপুস্তকে তিনি শিশুদের বয়স অনুযায়ী গল্প-কবিতা-রচনা লিখেছেন। তাঁর "পিঠা গাছের কাহিনী", "হিংসুকের পরিণাম", "রূপসী" "সিন্দবাদ সওদাগর" গল্প "বিশ্বাসের মূল্য" "মাছের দাম" নাটিকা ছোটদের প্রতি ভালবাসার এক উদাহরণ। "সেকালের রূপকথা" নামক একটি বইয়ে পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো তাঁর লেখাগুলি সংকলিত হয়ে বেরুবার কথা আছে। বেদ-পুরাণ থেকে ছোটদের জন্য গল্প আমাদের সাহিত্যে প্রচুর রচিত হয়েছে, কিন্তু কুর্‌আন-হাদীশ থেকে গল্প ছেলেমেয়েদের কেউ বলেন নি। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব এই অভাব পূরণ করেছেন। গীতা চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ যেমন ছোটদের জন্য লেখা হয়েছে, তেমনি শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবও ইসলামী ধর্মগ্রন্থ ছোটদের জন্য পরিবেশন করে-ছেন। "ছোটদের ইসলাম শিক্ষা", "ছোটদের দীনিয়াত শিক্ষা" তার উদাহরণ। হিন্দু সাধুসন্ত ধর্মগুরুদের জীবনীর যেমন প্রাচুর্য আছে সে-পরিমাণে ইসলামী সাধকদের জীবনী নেই। "ছোটদের রসূলুল্লাহ (দঃ)" "ছোটদের নবীকথা", "চরিত-কথা" (১ম ও ২য়) প্রভৃতি এজাতীয় বই। বইগুলির রচনাভঙ্গীও সরল, কোথাও জটিলতা নেই। যেমন—

: এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ জুড়িয়া খুব বড় এক মরুভূমি আছে। ইহার নাম আরব মরুভূমি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মরুভূমির দেশে আরবজাতি বাস করে। এককালে তাহারা লাত, মানাত, হবল ইত্যাদি ৩৬০টি দেব-দেবীর পুতুল বানাইয়া পূজা করিত, তাহা ছাড়াও তাহারা নানারকম গাছপালা, ইটপাথর প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া মানিত। এই জাতি ছোট ছোট শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পরস্পর মারামারি খুনাখুনি করিয়া সময় কাটাইত।

(ছোটদের রসূলুল্লাহ্‌)

ছোটদের সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব যে যে বিষয়ের অভাব দেখেছেন সেই সেই বিষয়ের অভাব পূরণের জন্য তিনি অবসর সময়ে বই লিখেছেন। ছোটদের জন্য পুরো সময় দেবার মত সাধ থাকলেও তাঁর সময় ছিল না। কেননা দেশ-বিদেশের

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সময় শেষ হয়ে যেত। তা বলে সস্তায় নাম কেনার জন্য তিনি উদ্ভট অবাস্তব কাহিনীকে আশ্রয় করে লিখতে হবে বলে লেখার তাগিদে রাশি রাশি বই লেখেন নি। সব সময় ছেলেমেয়েদের বৃহত্তর জীবনের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছেন। সত্যকে ন্যায়কে যাতে ছোটবেলা থেকেই উপলব্ধি করতে পারে, বুঝতে শেখে, সেজন্যে উদার মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ছোটদের সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন। সর্বপ্রকার নোংরামি, ইতরতা বর্জন করে বলিষ্ঠ জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা তাঁর শিশুসাহিত্য রচনার প্রধান মর্মকথা।

জ্ঞানধর্মী সাহিত্য-সৃষ্টিতে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের মনীষা যেমন সু-চিহ্নিত তেমন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে তাঁর মনস্বিতা প্রখর নয়। তিনি কিছু গল্প ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর কিছু গল্প সংকলিত হয়ে "রকমারী" (১৯৩২) নামে বেরিয়েছে। এই গল্পগ্রন্থে মৌলিক ও অনূদিত মোট তেরটি গল্প আছে। ছোট গল্প রচনায় তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে যে ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে একটি নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলা। সেজন্যে একটি ভাবের সমগ্রতা থাকায় পাঠককে আকর্ষণ করে। গল্পের মধ্যে কোথাও জড়তা নেই, চমক দেবার চেষ্টা নেই, মুসলমান সমাজজীবনের এক একটি ঘটনাকে তিনি গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। যেমন "লক্ষ্মীছাড়া" গল্প। এই গল্পে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব দেখিয়েছেন হজ করে পুণ্য অর্জন করার চাইতে একজন অসহায় মানুষের সেবা করার মধ্যে বেশী পুণ্য আছে। গল্পগুলির আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কোথাও নাটকীয়তা নেই। তিনি গল্পটি আরম্ভ করেছেন এইভাবে—

: শূন্য ঘরে রমযান চুপ ক'রে ব'সে আছে। তার সঙ্গে কোলের সেতারখানাও চুপ হ'য়ে আছে। সাঁঝের বাতি জ্বেলেই সে সেতার নিয়ে বসেছে; এখন রাত ১২টা বাজে। কিন্তু রমযানের সেদিকে আর খেয়াল নেই। সেতারখানা কোলেই আছে, কিন্তু মনে স্ফূর্তি নেই, হাতে বল নেই। সে কয়েকবার তার একটি প্রিয় গান গাইতে চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা ফুটল না। কেবল দু' চোখ দিয়ে গরম পানির মৃদু ঝরণা বয়ে চলল। ইত্যাদি

ভাষার সমস্ত অলঙ্কার বর্জন করে সাদামাঠা ভাষায় যে গল্প লেখা যায়, তার উদাহরণ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের গল্পগুলি। তাঁর গল্পগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সৎপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়া, তাকে সত্যাভিমুখী করা। সামান্য ঘটনা কিংবা বেশী চরিত্রের ঘনঘটা না করে মানবিক বৃত্তিগুলি যাতে পরিস্ফুট হয় সেদিকেই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। আজকের ছোটগল্পের উৎকর্ষের তুলনায় তাঁর গল্পগুলি নিষ্প্রভ। তার মধ্যে মানুষের ভাল করার এই মনোবৃত্তি কাজ করেছে বলে গল্পগুলি

নীতিকথায় পর্যবসিত হয়েছে। সমাজের হিতের জন্য আর যাই হোক গল্প লেখা যায় না, আব লিখলেও তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয় না।

তিনি একটি গল্পগ্রন্থ (গল্প-সঞ্চয়ন ১৯৫৩) সৈয়দ আলী আহ্সানেব সহযোগে সম্পাদনাও করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে ছোট গল্পের ধাবা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। মৈমনসিং-গীতিকার কিছু কাহিনী যেমন 'কাজলরেখা' 'মহুয়া' 'ভেলুয়া-সুন্দরী' গল্পে রূপান্তবিত কবেছেন। গল্পে রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে তাঁর গল্পের জন্মান্তরের কথা মনে পড়ল। পঞ্চতন্ত্র ও ঈশপের গল্পগুলি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লেখকের হাতে কিভাবে জন্মান্তবিত হয়েছে সেটি তিনি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন। ১৩৬৫ বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যা 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা'য় 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায় এবং 'সমকাল' ১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একই গল্পের জন্মান্তর ও রূপান্তর কিভাবে হয়েছে সেটি তাঁর মৌলিক গল্পের চেয়ে আমাদের কাছে বেশী চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এজাতীয় লেখা বেশী লেখেন নি।

তিনি কিছু মৌলিক কবিতা লিখেছেন। কবিতার বই গ্রন্থাকাবে বেরোয় নি, তবে তাঁর সংবর্ধনা-গ্রন্থে উনিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি সহজ সরল অনাড়ম্বর—একটি কবি-মনের বিভিন্ন মুডের চিত্র, যেমন ঈশ্বরানুভূতি, দেশপ্রেম, নৈরাশ্য, বেদনা, উদ্দীপনা প্রভৃতি অঙ্কিত হয়েছে। অনেকগুলি পাঠ্য-পুস্তকের তাগিদে লেখা, যেমন 'প্রার্থনা', 'নির্ভর', 'উন্নতি', 'বিনয়', 'অধ্যবসায়', 'ভালো ছেলে'। কিছু অনূদিত কবিতা রয়েছে, মূলের ভাব রক্ষিত হলেও কবিতা খোঁড়া হয়ে গেছে। এখানেও কবিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার দিকে মানুষকে যাবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। যেমন—

: ভুলেছ কি একেবারে ? ভুলেছ কি নর ?
কে তুমি ? কিসের তরে এলে ধরা 'পর ?…
মাটি হ'তে জনমিয়া উদ্ভিদের মত
মাটিতে মিশিয়া যাবে এই তব ব্রত ?

: গো-গর্দভের মতন খেয়ে দেয়ে শুয়ে
কীট পতঙ্গের মত নেচে কুদে নিয়ে
দিন দুই পরে ম'রে পচে গ'লে যাবে,
এজন্যে শুধু এ জন্যে জনমেছ ভবে ?

(জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি)

: বৃথা শোক রে মজনু ! জগৎ নশ্বর।
নশ্বর মানব দেহ, আত্মাই অমর।
মিলিবে লায়লী সনে ছাড়িয়া জগৎ,
রহিবে আত্মায় মিল অনন্ত যাবৎ।

(লায়লীর প্রতি মজনু)

'কবি ও ভ্রান্ত মানব' কবিতায় অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে হীনমন্যতা, হতাশা, নৈরাশ্য পবিত্যাগ করে জীবনযুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার ডাক দিয়েছেন—

: মুক্ত পাখীর মতন স্বাধীন,
খাঁচা তোমার মায়ার বাঁধা,
নয়নে তোমার কুহকের জাল,
দুখ তোমার কেবলি ধাঁধা।
অমর তুমি, মহান্ তুমি,
বিশ্ব লোটে চরণ চুমি,
নিবাস তব অমরা ভূমি।
আপন ভুলে তোমারি দুখ।
(তবে) কেন এ হীনতা কেন এ দীনতা,
কেন মলিন তোমারি মুখ ?
কেন কম্পিত ভূমি নিপতিত ?
কেন ভগ্ন তোমারি বুক ?

এ সব জীবনক্লান্তিমেদুর কবিতা আজকের দিনে ততটা পাঠকের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য জাগায় না। তাঁর কাব্যের আবেদন আমাদের জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তবু শহীদুল্লাহ্ সাহেব কবিতা লিখেছিলেন তার সাক্ষী হিসেবে এগুলি জীবনচরিতকারের কাছে লোভনীয় উপাদান।

এ প্রসঙ্গে তাঁর কবিতার ছন্দ সম্পর্ক কিছু বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেন না শহীদুল্লাহ্ সাহেব নিজেই বাংলা ছন্দ সম্পর্কে উৎসাহী। "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" (১৩৪২) গ্রন্থে ছন্দ সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁব মতে বাংলা ছন্দ তিন প্রকার— অক্ষববৃত্ত, বর্ণবৃত্ত, স্বরবৃত্ত। সংযুক্ত অক্ষবকে শহীদুল্লাহ্ সাহেব যেখানে বলেন 'বর্ণবৃত্ত', সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাকে 'মাত্রাবৃত্ত', অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 'ধ্বনিপ্রধান ছন্দ', মোহিতলাল 'মাত্রিক' বা 'পর্বভূমক ছন্দ', প্রবোধচন্দ্র সেন 'কলাবৃত্ত' বলেন। নামে কি এসে যায়, ছন্দের প্রকৃতি নিরূপণে ছান্দসিকদের মধ্যে মতবিরোধ নেই। প্রখ্যাত ছান্দসিক আবদুল কাদিব বলেছেন, "ডক্টর শহীদুল্লাহ্ উপরোক্ত ছন্দঃপ্রকরণে সনাতনী বৈয়াকবণগণের অনুসরণে অক্ষরবৃত্ত বীতিব পযাব, মধ্যসম পযার, পর্যাযসম পযাব, তরল পয়াব, হীনপদ পয়ার, ভঙ্গ পয়াব, লঘুত্রিপদী, তবল ত্রিপদী, হীনপদা, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গ লঘুত্রিপদী, নর্তক ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, হীনপদা দীর্ঘ-ত্রিপদী, ভঙ্গ দীর্ঘত্রিপদী, ললিত ত্রিপদী, চৌপদী, লঘু চৌপদী, দীর্ঘ চৌপদী, হীনপদী দীর্ঘচৌপদী, দীর্ঘ নর্তকচৌপদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দোবন্ধের পবিচয যেমন দিয়াছেন, তেমনই একালের অক্ষরবৃত্ত বীতির দীর্ঘ পয়াব, মাত্রাবৃত্ত বীতিব লঘুত্রিপদী ও স্ববৃত্ত রীতির চতুষ্পদীর পরিচয়ও দিয়াছেন। সংস্কৃত লঘু-গুরুব বীতিব ভুজঙ্গপ্রয়াত তূণক ও তোটক এবং বাংলায় রূপান্তরিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রাস্বরিক (accentual) রীতির মালিনী, রুচিরা, মন্দাক্রান্তা, শার্দূলবিক্রীড়িত ও পঞ্চচামর ছন্দেব স্বরূপ যেমন বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনই দিয়াছেন মধুসূদনের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট, গিরিশচন্দ্রের অমিল অসমপংক্তিক অক্ষরবৃত্ত, রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত পয়াব, ফারসী রীতিব গযল ও রুবাই পদবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁহার আলোচনার ভাষা প্রাঞ্জল, বক্তব্য পরিচ্ছন্ন।" (ছন্দোদর্শী শহীদুল্লাহ্ : শহীদুল্লাহ্-সংবর্ধনা গ্রন্থ)

তাঁর 'নব্য চীন' কবিতাটি অক্ষরবৃত্তে মূল-পর্ব পঞ্চাক্ষরে গঠিত।

তাঁর পূর্বে অনেকেই পাঁচ অক্ষরের পর্ব-বন্ধে কবিতা লিখেছিলেন তাঁর কবিতাটি ছন্দের কঠোর অনুশাসন মেনে চলেছে—

৫	৫	৫	৫
: নদী-ভূষিত	চির-হরিত	প্রাচীন সভ্য	হে চীন দেশ !
নব-জীবনে	জীবন-বস্ত	লভেছ তুমি	ভাগ্য অশেষ।

এখানে চারটি চরণে চারটি পর্বে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে অক্ষর। পঞ্চমাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ যেমন—

৫	৫	৫	৫
: চাঁদ-তারায়	শোভে মোদের	জাতীয় এই	মহা নিশান,
উন্নতি ও	সমৃদ্ধিতে	অগ্রগতি	কবে প্রদান।

(পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত)

এখানে প্রতি চরণে চার পর্ব ও প্রতিপর্বে পাঁচ কলা। তিনি দু-একটি সনেটও লিখেছেন কিন্তু সেগুলি মূল পেত্রার্কীয় সনেট নয়। জগতের অধিকাংশ সনেট যেমন মিশ্র রীতিতে রচিত, তারই অনুকরণে তাঁর সনেট রচিত হয়েছে। যেমন—

: কেন আজি প্রসারিত সহস্র নয়ন
পশ্চিম গগন পানে? খুঁজিতে কাহারে
সকলি ব্যাকুল এত? কার আগমন
আশায় উল্লাসে আজি মাতায় সবারে?

অই যে সুচারু বাঁকা ভুরুর মতন
আকাশে মোদের পাশে রাজে শশধর,
কি মদিরা আছে ওতে যাহার কারণ
সবে ওর দরশনে প্রফুল্ল-অন্তর?

পুণ্যরাজ রমযানের এই অগ্রচর,
বসন্ত ঋতুর যথা দূত পিকবর।

অথবা এ বিধাতার শরীরিণী বাণী
রোযা-ব্রত পালিবারে ডাকিছে সবায় ,
কিংবা পাঠায়েছে এরে পূর্বে ঈদ-রাণী,
যেমতি পাঠায় ঊষা শুক্র তারকায় ॥

এই সনেটের অষ্টকে ওয়ার্ডসওয়র্থীয় রীতি ভেঙে প্রমথ চৌধুরীর পদ্ধতিতে ষটকে মিল দেখানো হয়েছে অর্থাৎ মিলবিন্যাস হ'ল কখ কখ, কগ কগ। গগ, ঘঙ ঘঙ। ছন্দের নিখুঁত উদাহরণ থাকলেও শহীদুল্লাহ্ সাহেবেব কবিতায প্রাণ নেই।

গল্প-কবিতা সম্পর্কে শুধু একটি কথা বলা যেতে পারে যে তিনি গুরুগম্ভীর বিষয়ান্তরে প্রবেশ কবাব আগে কিংবা পরে হালকাভাবে এসব রচনায় একটু বিশ্রাম নিয়েছেন মাত্র। এগুলি তাঁর খ্যাতিব নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়, তাঁব জীবনেব পরিচয় মাত্র ॥

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ শুধু গবেষণা করেই জীবন অতিবাহিত করেন নি। সমাজের মধ্যে সাহিত্য ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত পুষ্ট ও রসসিক্ত করার বাসনায় তিনি মাঝে মাঝে কিছু পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পূর্বে তিনি "আল-এস্‌লাম" "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা", "আঙ্গুর" সম্পাদনা করেছিলেন। ঢাকায় এসে "Peace" "বঙ্গভূমি" "তক্‌বীর" নামক পত্রিকা বের করেছিলেন। প্রতিটি পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ ও আদর্শপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেই শুধু লেখেন নি তাঁর মতাদর্শে একদল লেখকও সৃষ্টি করেছিলেন। "পীস" মাসিকপত্রে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল যাঁরা উত্তরজীবনে খ্যাতিমান হয়েছেন। নতুন লেখকদের লেখা তিনি সাগ্রহে ছাপতেন। "আঙ্গুর" সম্পাদনার সময় তিনি ছোটদের মত করে লেখা লিখেছেন। সেগুলি এত সরল ও স্বচ্ছ যে একজন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকের লেখা বলেই মনে হয় না—সেখানে তিনি একেবারে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদনার সময় তার যাবতীয় লেখা যাতে সামান্য শিক্ষিত লোকও বুঝতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি কলম চালাতেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "আত্মানং বিদ্ধি"— নিজেকে জানো। দেশের সমাজ-সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস, ধর্মের মূল বাণী ইত্যাদি মুসলমান সমাজে প্রচারের ফলে এযুগের মুসলমান আত্মস্থ হতে শিখেছে, তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জেগেছে। দেশ ও সমাজের প্রতি আনুগত্য ও প্রেম যাতে আরও নিবিড় হয় সেটিই তিনি চেয়েছেন। নিজেকে চেনার পর মুসলমান সমাজ অনায়াসেই নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারবে—এই রকম আশা তাঁর ছিল। তাই তিনি নির্ভীকতার সঙ্গে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছেন। জাতির ত্রুটি সংশোধন

ওপর থেকে হয় না ; গোড়া ধরে টান না দিতে পারলে, চেতনাকে সজীব ও সমৃদ্ধ না কবতে পারলে, সামাজিক প্রগতি হয় না। মুসলমান সমাজে আজ যে যুক্তি ও জ্ঞানেব দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার মূলে আছেন তিনি এবং তাঁব সম্পাদিত পত্রিকাসমূহ আর তাঁর অমূল্য প্রবন্ধবাজি। মুসলমান সমাজকে গোঁড়ামি ও সংস্কাবের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার কবে ধর্মেব উদার মুক্তাঙ্গনে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে তিনি ইসলামী সংস্কৃতিব সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মিলন সাধন কবেছেন। জ্ঞানেব আলোকে উদ্ভাসিত ও শুভ্র দৃষ্টিভঙ্গী তাঁব ছিল বলে তার সম্পাদকীয় সুযুক্তিপূর্ণ, তীব্র, ভদ্র ও সংযত হ'ত , সেজন্য সেটি সম্প্রদায় বিশেষেব হ'ত না, সর্বশ্রেণীই তার মধ্যে চিন্তা কবাব মত বস্তু পেত।

আল-এসলাম

"আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙ্গালা"ব সচিত্র মাসিক মুখপত্র ছিল "আল-এসলাম"। প্রথম প্রকাশ তারিখ ১৩২২ বৈশাখ, ১৯১৫ এপ্রিল-মে। পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, "ধর্ম-তত্ত্বের আলোচনা, এসলামের মাহাত্ম্যপ্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগেব দ্বাবা সংশয়াদিব খণ্ডন, সমাজ-সংস্কাব, অন্ধ বিশ্বাসাদির মূলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা-প্রবৃত্তির স্ফূর্তিসাধন প্রভৃতিই 'আল-এসলামে'র প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্তব্য।" মুসলমানদেব স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠা বিষযে সচেতন থাকলেও পত্রিকা-কর্তৃপক্ষেব লক্ষ্য ছিল, "ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া জাতীয় সৎসাহিত্য ও মাতৃভাষাব সাহায্যে দেশেব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব-বন্ধনেব চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্যসেবকগণেব প্রধান কর্তব্য।" 'আল-এসলামে'র বার্ষিক মূল্য ছিল ২৷৵ (২'৩৭) এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার আনা (২৫ পয়সা)। 'আল-এসলাম' নামক প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেছেন, "আঞ্জুমান-ই-উলেমা-ই বাঙ্গলাব প্রধান কীর্তি তার মুখপত্র 'আল-এসলাম' পত্রিকা। আঞ্জুমানের সেক্রেটারী, জয়েন্ট

সেক্রেটারী ও এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী যথাক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ আকরাম খান, মৌঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং বর্তমান লেখক ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক।" (মাহে নও, পৌষ ১৩৬৯) এই পত্রিকার আয়ু বছর পাঁচেক ছিল। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ইসলাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লিখেছিলেন। ধর্মকে তিনি বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে প্রথম আলোচনা করেন, লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের সঙ্গে কুর্‌আনের সাদৃশ্য দেখান। শ্রাবণ ১৩২২ সংখ্যায় প্রকাশিত "কুর্‌আন শরীফ ও বিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন, "কুর্‌আন শরীফ কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। কুর্‌আনে আল্লার মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য প্রাসঙ্গিক-রূপে এরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আশ্চর্যরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি দুই এক স্থানে সামান্য কিছু অমিল দেখা যায়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বশতঃই।" এই পত্রিকায় তাঁর নিম্নোক্ত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়—

: বৈশাখ ১৩২২ : পুণ্যকথা
শ্রাবণ ১৩২২ : কুর্‌আন শরীফ ও বিজ্ঞান
কার্তিক ১৩২২ : কুর্‌আন শরীফ ও জ্যোতিষ
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ : আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা
আষাঢ় ১৩২৩ : কুর্‌আন শরীফ ও পুনর্জন্মবাদ
জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি (কবিতা)
শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ : খৃষ্টীয় চতুর্থ গ্রন্থসমূহের ইতিহাস
আশ্বিন ১৩২৩ : কবি ও ভ্রান্ত মানব (কবিতা)
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ : কুর্‌আন শরীফ ও দুঃখতত্ত্ব
পৌষ ১৩২৫ : ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও আমাদের আশা
বৈশাখ ১৩২৬ : কসীদতুল্ বুর্দঃ
আষাঢ় ১৩২৬ : চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্রসম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা

মুসলমানদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যচর্চা প্রসারের জন্য তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অনুকরণে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি" গঠন করেন (১৯১১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর)। এই সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্ররূপে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা" ১৩২৫, বৈশাখ মাসে বেরোয়। পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোজাম্মেল হক। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল দেড় টাকা ও সমিতির সভ্যদের জন্য ছিল এক টাকা। প্রকৃতপক্ষে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকেই পত্রিকা-সম্পাদনার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হ'ত। এ সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সহকারীরূপে কাজ করতেন। পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ (১৩২৭) পর্যন্ত তিনি যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। পরে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চারার হয়ে চলে যাওয়ার সময় (১৯২১, ২রা জুন : ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ) পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব মোজাম্মেল হকের ওপর অর্পিত হয়। এই পত্রিকায় তাঁর নিম্নোক্ত রচনা বেরোয়—

: বৈশাখ ১৩২৫ : আমাদের ভাষাসমস্যা
শ্রাবণ ১৩২৫ : কবীর সাহেব ও হিন্দুধর্ম
বৈশাখ ১৩২৬ : শেখ হবিবুর রহমানের আবে হায়াতের সমালোচনা
শ্রাবণ ১৩২৭ : বানত-সু 'আদ
কার্তিক ১৩২৭ : নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত
'ময়নামতীর গান' (সমালোচনা)
মাঘ ১৩২৭ : কুর্‌আন শরীফ ও যুদ্ধনীতি
শ্রাবণ ১৩২৭ : ইবন বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ
শ্রাবণ ১৩২৯ : সত্যেন্দ্র-স্মরণে (কবিতা)

আঙুর

বাংলাদেশে "সন্দেশ" "মৌচাক" প্রভৃতি পত্রিকা ছোটদের জন্য থাকলেও শহীদুল্লাহ্ "আঙুর" নামে একটি শিশু মাসিক পত্রিকা

বের করেন (১৩২৭, বৈশাখ)। এই পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইসলামী কথা ও কাহিনী সরলমতি বালকবালিকাগণের উপযোগী করে পরিবেশিত হ'ত যা "সন্দেশ" "মৌচাকে" অলভ্য ছিল। হিন্দু পুরাণের কাহিনী-আখ্যায়িকা "সন্দেশ" প্রভৃতি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু কুর্‌আন হাদীশ ইত্যাদির গল্প তেমন প্রচারিত হয় নি। প্রধানত এই অভাববোধ থেকেই শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব তাঁর "আঙ্গুর" পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল দু টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যার দাম তিন আনা। পত্রিকার আয়ু ছিল মাত্র এক বছর। ঢাকা চলে আসার ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কুর্‌আন হাদীশের প্রসঙ্গ থাকলেও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই পত্রিকায় লিখেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এই পত্রিকা সম্পর্কে সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রাচীন লৌকিক কাহিনীর জন্য একটি প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ('রথযাত্রা' ১ম সংখ্যায়), নজরুল ইসলাম ('হোদল কুঁৎ কুঁতের বিজ্ঞাপন', ৩য় সংখ্যায়) শাহাদৎ হোসেন, মোজাম্মেল হক, এ. কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, হেমন্তকুমার সরকার, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই লিখেছেন। বহু শিশুসাহিত্যিক পরে যাঁরা খ্যাতনামা হয়েছেন তাঁদের অনেকের লেখার হাতেখড়ি এই "আঙ্গুর" পত্রে। যেমন শামসুন্‌ নাহারের প্রথম কবিতা "প্রণতি" আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়। এই পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব ছোটদের উপযোগী গল্প, উপকথা, রূপকথা কবিতা ইত্যাদি লিখেছেন। এখানে তাঁর লেখার তালিকা দিলাম—

: বৈশাখ ১৩২৭	:	তিন শিষ্যের কথা (মহাভারত থেকে)
		পরিশ্রম (কবিতা, আরবী থেকে)
জ্যৈষ্ঠ	:	বিধাতার পরীক্ষা (হাদীশ থেকে)
		তিন শিষ্যের কথা
		পিঠা গাছের কাহিনী (রূপকথা)

আষাঢ়	:	রূপসী (দেনমার্কের রূপকথা)
		ঈশ্বর যাহা করেন ভালর জন্যই করেন (কুর্‌আন ও হাদীশ থেকে)
	:	গল্প
	:	ভেল্‌কির মজা
শ্রাবণ	:	রূপসী (উপকথা)
		বিনয় (কবিতা, কালিদাসের শকুন্তলা থেকে)
ভাদ্র	:	বেলগাড়ীব জন্মকথা
		হজরত লোকমান (জীবনী)
পৌষ	:	গোলাম বাদশাহ (ইতিকথা)
ফাল্গুন	:	বোস্তম পালোয়ান

এছাড়া শিশুদের মনোবঞ্জনেব জন্য ধাঁধা প্রশ্ন অঙ্ক খেলাধূলা ইত্যাদিও তাঁকে লিখতে হ'ত।

The Peace

ঢাকা থেকে ১৯২২ সালেব আগস্ট মাসে "পীস" নামে তিনি এক ধর্মতত্ত্বের মাসিক পত্রিকা বেব কবেন। 'আল এসলাম' পত্রিকার যা আদর্শ ছিল "পীসের"ও তাই ছিল। এই পত্রিকাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক জানান "Our immediate object in starting this paper is to disseminate the truth, beauty and teachings of Islam among the English knowing people, specially among the Muslim youths, with whom it lies to retrieve its lost glory and prestige." (Ourselves : Vol I. No I) এই পত্রিকাটি প্রকাশনেব পাবিপাট্যে, বচনা-গৌববে বিদ্বৎসমাজে শ্রেষ্ঠ পত্রিকাব আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়। এই পত্রিকার চীন, জাপান, আমেরিকা, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া প্রভৃতি দেশেব লেখক পাঠক গ্রাহক ছিলেন। দেশ-বিদেশের মনীষীরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। টি. এল. ভাসওয়ানী, লিন ক্লোন গ্লিক প্রভৃতির বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তৎকালীন ঢাকার শিক্ষক ও

ছাত্র-সমাজের মধ্যে এই পত্রিকাটি বিশেষ আলোড়ন আনে। ছাত্রদের মধ্যে একটি লেখকগোষ্ঠী তিনি তৈরী করেছিলেন— ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন, ডঃ সইদুল ইসলাম বোরা, আলতাফ হোসেন ('ডন' পত্রিকা সম্পাদক), এ. এফ. এম. আবদুল হক প্রভৃতি। এই পত্রিকা আট বছর চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বার্ষিক চাঁদা ছিল দুই টাকা চার আনা, ছাত্রদের জন্য ছিল এক টাকা চার আনা। মাঝে শহীদুল্লাহ্ সাহেব যখন পড়াশুনার জন্য প্যারিস গিয়েছিলেন তখন একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে দিয়ে যান। এই পত্রিকায় তাঁর ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, আরবী ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির ওপর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত রচনার তালিকা হল এই—

1922

August	The Religion of Peace
September	The Mission and the Message of the Prophet of Arabia
October	The Reformation in the Light of Islam
	Qurbani
November	Ad-du'a a'us Suryance
December	As-ha abul Kahaf

1923

April	Fasting
June-July	The Highest Good according to Quran

1924

January	: God's Message to the Christians
March	: The Testament of Abu Hanifa
April, June, July	: Faith of Islam : God, Angels, the Books and the Prophet
June-July	: The Hajj

1925

March	: Derivation of the Biblical Proper names in the Quran
	Ramadhan
September	: Indian Loan words in Arabic

1926

January	Resurrection and Last day (১৯২৪ সালে প্রকাশিত Faith of Islam প্রবন্ধের শেষাংশ)

1927

July-August	The French poet and writer—De Lamartine on the Prophet of Islam

1928

September	God and Man

1929

March	The Life of Abd-al-Karim the Hero of Rif
June-July	Reading from the Quran—Muharram-safar
July-August :	Some Prayers of the Prophet
September :	Napoleon on Islam
October :	Educational Problems in India

1930

January	Non-Violence in Islam Adam and Eve
Feb-March May-June-July	Pearls from Hafiz
March :	Abel and Cain
April :	Noah, the Prophet of Allah
May :	Hood and his people
June-July :	Islam and Hinduism
June	The Rites and Rituals of Islam Salih and his people
August :	Loqman, the wise
September-October	Literary and Scientific Development of Islam (tran from L' Islam by Edward Monlet)

বঙ্গভূমি

বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা "বঙ্গভূমি" ১৩৪৪, আষাঢ় (১৯৩৭ জুন-জুলাই) মাস থেকে তিনি বের করেন। পত্রিকার প্রচ্ছদ-

পটে পরিচালকরূপে তাঁর নাম থাকত— সম্পাদক ছিলেন অন্যজন। প্রকৃতপক্ষে শহীদুল্লাহ্ সাহেবই ছিলেন সম্পাদক। পরিচালকরূপে তাঁর নাম থাকার অন্যতম কারণ ছিল তখন তিনি সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছেন। সম্পাদক হওয়া কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত না হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি নিজের নাম পরিচালক হিসেবে ব্যবহার করেন। এই পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল— মাত্র ছ'টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনার তালিকা—

: আষাঢ় ১৩৪৪ : আর্যজাতির প্রাচীনতম প্রেমকাহিনী
: অভিভাষণ (চাঁদপুর মুসলিম যুবকসমিতির একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ ২. ৫. ৩৭)
শ্রাবণ : জাতীয় মিলনের পথে
ভাদ্র : হাফিয
: লায়লীর প্রতি মজনূঁ (কবিতা)

তকবীর

বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালে তাঁর সম্পাদনায় ১৯৪৭ অক্টোবরে (১৩৫৪, ২৩ আশ্বিন) "তকবীর" নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির মাত্র আঠারটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। ১৩৫৫, ৪ঠা আষাঢ়ের পর আর কোন সংখ্যা বেরোয় নি। তাঁর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—

ঈদুল আযহা। প্রাচীন ভারতে গোবধ। পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষাসমস্যা, কারবালা কাহিনী। শেষ নবী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। অভিভাষণ (পূর্ব-পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ২. ৫. ৪৮)।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ পঞ্চাশ বছরের অধিককাল শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি প্রচলিত শিক্ষার দোষ-ত্রুটি বুঝতে পেরেছেন এবং এর প্রতিকারার্থে তিনি শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তনের কথাও ভেবেছেন। তিনি দেখেছেন আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শিক্ষায় জীবনের পাঠ কিছুই থাকে না আর ছেলেরাও ঐ শিক্ষা রপ্ত করেই চাকরীতে লেগে যায়— শিক্ষার প্রকৃত চর্চা হয় না। তিনি যে সব পন্থা নির্দেশ করেছেন তা অধিকাংশ মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পাকিস্তানে বাস করার ফলে ঐ স্থানের প্রয়োজন ও পরিবেশের ওপর তাঁর পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। পরিকল্পনায় মৌলিক কিছু নেই, পাঠক্রম কিভাবে অনুসরণ করলে ছাত্রোপযোগী হবে সে কথাই বলা হয়েছে। তবে তাঁর পরিকল্পনায় এমন কয়েকটি সার্বজনীন রূপ আছে যা আমাদেরও ভাবিয়ে তুলতে পারে।

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পাঁচটি ত্রুটি তিনি নির্দেশ করেছেন—

: ১. লেখাপড়া শিখে অনেকেই হাভাতে হয়। কিন্তু শিক্ষা জ্ঞানলাভের জন্য ; অন্নলাভ উপরিলাভ মাত্র।

২. স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয় না, হয় শুধু গোলামি বুদ্ধি।…পরীক্ষার জন্য যেটুকু দরকার ছেলেরা তাব এক চুলও বেশী পডতে বাজী নয়।

৩. ধর্মশিক্ষা হয় না।

৪. বর্তমান শিক্ষায় জাতীয়তা জাগে না।…যাতে দেশের ঠিক অবস্থা ছেলেরা জানতে পারে, যাতে কবে তাদের মনে দেশাত্মবোধ জাগে, যাতে দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাই-ভাব জন্মে, যাতে তাদেব কল্পনা জন্মভূমির মুক্তির দিকে ধায়, এমন বই-কেতাব স্কুল-কলেজে পডান হয় না।

৫. এই শিক্ষায় মানুষ হয় না।…নীতি সম্বন্ধে কোন বই তাদের পড়ান হয় না। ছাত্রেরা পড়ে পাশের জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য নয়। তাদের অনেকের

তো 'লিখনং পঠনং পাশেরই কারণং'। কাজেই চরিত্র গড়তে তাদের যত্ন অতি অল্পই দেখা যায়।

উপরোক্ত পাঁচটি ত্রুটির কথা সামনে রেখে সমাধানকল্পে তিনি নিম্ন থেকে উচ্চশিক্ষার পাঠপদ্ধতি কেমন করা উচিত তার একটি পরিকল্পনা "পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষাসমস্যা" নামক প্রবন্ধে দিয়েছেন—

: আমি সমগ্র শিক্ষাকে তিন স্তরে বিভক্ত করিব— প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ। বাংলা দেশে সর্বত্র শিক্ষাব মাধ্যম হইবে বাংলা। আমি এবিষয়ে গ্যারান্টি দিতে পারি যে বাংলা শিক্ষাব বাহন হইলে সর্ববিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের কোনও অভাব হইবে না। শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাব জন্য প্রতীক্ষমাণ হইয়া আছেন।

১। প্রাথমিক শিক্ষা : ক. নিম্ন পাথমিক— প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী। পাঠ্য —কেবল বাংলা। খ. উচ্চ প্রাথমিক— চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী। পাঠ্য ১. আবশ্যিক (compulsory) বাংলা, ২. ইচ্ছাধীন উর্দু কিংবা ইংরেজী। এই ছয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হওয়া আশু কর্তব্য।

বর্তমানে শিক্ষার তিনটি ধারা বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। ১. সাধারণ শিক্ষা স্কুল ও কলেজে। ২. প্রাচীন পদ্ধতির আরবী শিক্ষা (Old Scheme Madrasah Education) মাদ্রাসায়। ৩. নূতন পদ্ধতির আরবী শিক্ষা (New or Reformed Scheme Madrasah Education) হাই মাদ্রাসা, ইসলামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট (Islamic Intermediate) কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে (Islamic Studies Department)। এই তিনটি ধারাই সরকারের অনুমোদিত। আমরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি মাত্র ধারা চাই। এই জন্য প্রাথমিকের ইচ্ছাধীন উর্দু ভবিষ্যতে উচ্চ আরবী শিক্ষার্থীদেব জন্য আবশ্যিক (compulsory) হইবে। যাহারা ভবিষ্যতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িবে, তাহারা উচ্চ প্রাথমিকে আবশ্যিকভাবে ইংরেজী কিংবা উর্দু পড়িবে।

বর্তমানে তিন ধারার একীকরণ নিম্নের ছয় শ্রেণীতে হইবে। ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার জন্যও একীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ মুসলিম সমাজের মধ্যে ভাবের অনৈক্য ঘুচিবে না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানবিবর্জিত ধর্মশিক্ষা

কথনই সুফলপ্রদ হইতে পারে না। এই জন্য নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার পর উচ্চাঙ্গের ধর্মবিত্তালয় (Theological College) বা মাদ্রাসার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া কর্তব্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি। নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয় এখন বলিব।

২। মাধ্যমিক শিক্ষা: ক. নিম্ন-মাধ্যমিক ৭—৯ শ্রেণী। পাঠ্য— ১. আবশ্যিক বাংলা। ২. আবশ্যিক ইংরেজী (যাহারা প্রাথমিক ইচ্ছাধীন উর্দু পড়িয়াছে)। ৩. দ্বিতীয় ভাষা (মুসলমানের জন্য) আরবী, (হিন্দুদের জন্য) সংস্কৃত, (বৌদ্ধদের জন্য) পালি, কিংবা (অন্য যাহাদেব মাতৃভাষা হিন্দী বা উর্দু নহে) হিন্দী। ৪. ইচ্ছাধীন উচ্চ-মানের ইংরেজী (যাহারা প্রাথমিক ইংরেজী পড়িয়াছে) কিংবা ইচ্ছাধীন উচ্চ মানের উর্দু (যাহাবা প্রাথমিক উর্দু পডিয়াছে)। যাহারা বৃত্তিমূলক (Vocational) বা শিল্পমূলক (technical) কিংবা বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভে ইচ্ছুক কিংবা উচ্চ-ধর্মশিক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া বিশেষ বিশেষ বিত্তালয়ে বা মাদ্রাসায় ভর্তি হইতে পারিবে। ভবিষ্যতে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষাও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। খ. উচ্চ মাধ্যমিক ১০, ১১ শ্রেণী। পাঠ্য— ১. আবশ্যিক বাংলা ২, আবশ্যিক উচ্চ-মানের উর্দু (যাহারা নিম্ন-মাধ্যমিকে আবশ্যিক ইংবেজী পডিয়াছে এবং ইচ্ছাধীন উর্দু পড়ে নাই); কিংবা আবশ্যিক উচ্চ-মানের ইংরেজী (যাহাবা নিম্ন-মাধ্যমিকে আবশ্যিক উর্দু পড়িয়াছে এবং ইচ্ছাধীন ইংরেজী পডে নাই)। ৩. দ্বিতীয় ভাষা আরবী ইত্যাদি নিম্ন-মাধ্যমিক হইতে উচ্চ-মানের। ৪. ইচ্ছাধীন উচ্চ-মানের ইংরেজী (যাহারা আবশ্যিক উচ্চ-মানের উর্দু লইয়াছে) কিংবা ইচ্ছাধীন উচ্চ-মানের উর্দু (যাহারা আবশ্যিক উচ্চ-মানের ইংরেজী লইয়াছে)।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রগণ কলেজে প্রবেশাধিকার পাইবে। এই ১১ বৎসরে বাংলা ভাষা শেখা হইবে ১১ বৎসর, উর্দু এবং ইংরেজী আবশ্যিকভাবে ৫ বৎসর ও ইচ্ছাধীনক্রমে ৮ বৎসর, দ্বিতীয় ভাষা আরবী ইত্যাদি ৫ বৎসর। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক হইবে এবং তজ্জন্য একটি পাঠ্যতালিকা (Syllabus) প্রস্তুত করা প্রয়োজন হইবে। কোনও ছাত্রের অভিভাবক ইচ্ছা করিলে তাহাকে ধর্মশিক্ষা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিবেন।

৩। উচ্চ-শিক্ষা— ১, ২, ৩ বার্ষিক শ্রেণী। পাঠ্য— ১. আবশ্যিক বাংলা। ২. আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা আরবী, উর্দু, সংস্কৃত, পালি কিংবা (যাহাদের উর্দু কিংবা হিন্দী নয়) হিন্দী। ৩. ইচ্ছাধীন তৃতীয় ভাষা— ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান, রুশ, তুর্কী, পারসী, পুষতু, চীনা, তিব্বতী, জাপানী, জাভানী, গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, আভেস্তান কিংবা উর্দু ও হিন্দী ব্যতীত ভারতেব যে কোন একটি প্রধান ভাষা।

যাহারা বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী, তাহাদেব জন্য উচ্চ-শিক্ষার তিন বৎসরের পৃথক পাঠ্যতালিকা হইবে। এই বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণ মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ কবিবে। সমস্ত কলাবিষয়ক (Arts) শিক্ষা ১৪ বৎসরে শেষ হইবে। বর্তমানে ১৬ বৎসর লাগিতেছে। ইহাতে অনেক সময় ও অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

উচ্চ-শিক্ষার পর গবেষণার জন্য রাষ্ট্রীয় কলাবিষয়ক কিংবা বিজ্ঞানবিষয়ক (State Arts or Science College) স্বদেশীয় বা বৈদেশিক অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে কার্য করিতে হইবে। ইহার শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হইবে। ইহা কেবল মেধাবী গবেষণা-ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। গবেষণার পারদর্শিতার পরিচয়সূচক একটি উপাধি ছাত্রদিগকে দেওয়া যাইবে। ছাত্রদিগকে গবেষণার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইবে না।

এই পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সমর্থন করেন। তা বলে ইংরেজীকে বাদ দেবার কথা বলেন না, "ইংরেজী ভাষা শেখা দরকার, খুবই দরকার। ভারত স্বরাজ্য পেলেও আমাদের ইংরেজী পড়তে হবে, শিখতে হবে। ইংরেজী বাদ দিলে ফরাসী কি জার্মান ভাষা শিখতে হবে। মোট কথা, হাল-জগতের সঙ্গে যোগ রাখতে এ ভাষাগুলি নেহাত দরকার। এগুলির মধ্যে আবার ইংরেজী সকলের চেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই চাই ইংরেজী।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাস রচনা প্রধানত তাঁরই কীর্তি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের একত্রীকরণ করে ভাষা ও সাহিত্যের সমান্তরাল যোগাযোগ যেমন ছাত্রদের

ধরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা দেখা যায় সেইরকম শহীদুল্লাহ্ সাহেব বাংলা সিলেবাসেও সাহিত্য ও ভাষার দুটি প্রবাহ যুগবিভাগের মাধ্যমে পাশাপাশি উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ প্রাচীনকালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, মধ্যযুগেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনেব ইতিহাস, সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার পটভূমিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব তুলনামূলক বিবর্তনটিও ছাত্ররা যাতে হৃদয়ঙ্গম করতে পাবে সে-দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি ১৯২১ সালে সিলেবাস রচনা কবেছিলেন। তাঁব এই সিলেবাসের কাঠামো এমনই সাফল্য এনে দিয়েছে যে আজও তাব পরিবর্তন করার দরকার পড়ে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন এই পদ্ধতিতে সেখানকার বাংলা সিলেবাসও বচনা করেছিলেন।

মানুষের বহুমুখী রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষাকে নানা জনের উপযোগী করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে ধর্মনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান মানুষ গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা যদি শুধু অর্থোপার্জনের লক্ষ্য হয় তাহলে সে শিক্ষায় চরিত্র গঠিত হয় না, মানুষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে প্রেমধর্মের সার্থক সমন্বয়ে শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রেমের উন্মেষ হবে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা পঠনে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেছেন, "আমরা এতদিন ছাত্রদের মস্তিষ্কের খোরাক দিয়েছি। এখন তাদের দেহ ও আত্মার দিকেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।...শিক্ষাবিভাগের আশু কর্তব্য হচ্ছে সামবিক ড্রিল এবং ধর্ম ও নীতিশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। আমাদের মনে রাখতে হবে 'for what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?' এই গুরুগম্ভীর বিষয়টি একজন ইংরেজ লেখক সরল করে বলেছেন, 'If you teach your children three R'S, but leave the fourth R (religion), then they will be the fifth R (rascal)." ১৯৪৪ সালে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেণীর

বিদ্যায়তনের সর্বস্তরেই ধর্মশিক্ষা দেবার আইন পাশ হয়েছিল। আমাদের দেশেও বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মধ্যে ধর্মশিক্ষা দেবার কথা বলেছিলেন।

মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর। তাকে জাগাতে হলে ধর্মের মাধ্যমে জাগাতে হবে কেননা ধর্ম নিয়ে তারা বেশী মাতামাতি করে। শিক্ষার অভাবে ধর্মের প্রকৃত অর্থ তাদের বোধগম্য হয় না। মুসলমান সমাজে মেলামেশা করে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, "প্রত্যেক খ্রীস্টান বালক তাহার বাইবেল জানে, যে পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমান বালক তেমনই তাহার কুর্‌আন শরীফকে না জানিবে সে পর্যন্ত মুসলমান সমাজ জাগিবে না।" এই কুর্‌আন শরীফ শিক্ষা-দান মক্তব-মাদ্রাসাতেই হয়ে থাকে কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম উর্দু ভাষা। বাঙলাদেশে মক্তব মাদ্রাসাতে উত্তরভারতের পাঠপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বাংলার মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রাদি আলোচনার ব্যবস্থা না করলে ধর্মের মূল সৌন্দর্য পড়ুয়াদের মনে পরিস্ফুট হয় না। সেজন্যে তিনি মক্তব-মাদ্রাসায় বাংলাভাষা অবশ্য পাঠ্য করার কথা বলেছেন। উত্তরভারতে অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রদের মাতৃভাষা উর্দু, কাজেই উর্দুর মাধ্যমে তারা যত সহজে আরবী রপ্ত করতে পারে বাঙলাদেশের ছাত্ররা উর্দুর মাধ্যমে আরবীকে তত সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। কেননা তাদের কাছে উর্দু ও আরবী দুটোই বিদেশী ভাষা। ফলে তারা না শেখে উর্দু না শেখে আরবী। তাই অবিলম্বে পাঠ-পদ্ধতির ত্রুটি অপনোদন করার কথা শহীদুল্লাহ্ সাহেব বলেছেন, "হিন্দুস্তানী আলীমগণ উর্দু ভাষায় কুর্‌আন শরীফের অনুবাদ এবং তফসীর, ফিক্‌হ, হদীস, তসউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া এতদ্বিষয়ক আরবী, পারসী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দুভাষায় সর্বাঙ্গসুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।... আমাদের মৌলভী-মৌলানাগণ বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্মগ্রন্থের

অমর্যাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না।… ফলে তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সামান্ত বাংলা-জানা শ্রোতারা পর্যন্ত হাসিবে কি কাঁদিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না। তাঁহাদের বাংলা ভাষায় যেমন দখল, উর্দুতেও তেমন। স্কুলের ন্যায় যে পর্যন্ত বাংলার মাদ্রাসায়ও বাংলা ভাষা অবশ্যপাঠ্য দেশীয় ভাষা রূপে স্থান না পাইবে, সে পর্যন্ত আমাদের এ দুরবস্থা ঘুচিবে না।” খাঁটি বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করলে মক্তব-মাদ্রাসার মৌলবীরা চট করে বাংলা বুঝতে পারবেন না। সেজন্যে উর্দু-আরবী শব্দ নিয়ে মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করাব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে শহীদুল্লাহ্ সাহেব অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। এই পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও রচনা নিয়ে একদিন বাঙলাদেশে প্রচুর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকেব প্রার্থী হবার সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই মিশ্র বাংলা রীতির কথা তুলেছিলেন। মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে জনৈক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রবাসী’র বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায় “মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। উক্ত আলোচনায় একস্থানে তিনি বলেছিলেন, “সুশিক্ষিত শিষ্টভাষা-পটু মুসলমান লেখককেও হিন্দুবিদ্বেষ ও আরবী অনুকরণেচ্ছারূপ সমাজের দূষিত মনোবৃত্তির সন্তোষসাধনার্থ ঐ ‘খিচুড়ী’ ভাষাই ব্যবহাব করিতে হইয়াছে ; স্বভাবতই ও সহজেই যে ভাষা আসিয়া পড়ে, অকারণ মাঝে মাঝে দু-একটা বিকট আরবী-ফার্সী কথা মিশাইয়া, সেই ভাষাকে একটা কুৎসিত করিয়া, তবে একশ্রেণীর লোকের আদরণীয় করিতে হইয়াছে। ‘ডক্টর পণ্ডিত’ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রণীত ‘মক্তব-মাদ্রাসা শিক্ষা’ ‘২য় ভাগ’ তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।” রবীন্দ্রনাথও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ‘প্রবাসী’ ভাদ্র ১৩৩৯ সংখ্যায় বলেছিলেন, “শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবিয়ানা-পারসিয়ানা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা

বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজী স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসী বা আরবী ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন ?...শিক্ষক জানেন পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজীকে বিকৃত করার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিলে ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষায় গলদ ঘটবে, তারা ঐ ভাষা সম্যকরূপে ব্যবহার করতে পারবে না।...সেই একই কারণে ছাত্রদের নিজের খাতিরেই বাংলাটাকে খাঁটি বাংলারূপে বজায় রেখেই তাদের শেখানো দরকার।" (মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা)। শহীদুল্লাহ্ সাহেব এই যুক্তি স্বীকার করেন। কেননা ঐ জাতীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়া তাঁর নিজের মৌলিক গ্রন্থে খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করেন নি। মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকেব নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন এই ভরসায় যদি তার স্ব-সমাজ মিশ্ররীতিতে বাংলার রস উপলব্ধি করে পরে খাঁটি বাংলা ভাষার রত্ন-ভাণ্ডারের খোঁজ নেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরও মক্তব-মাদ্রাসার পাঠপদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয় নি—উর্দু আরও আসর জাঁকিয়ে বসে। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক-সম্মেলনে ঐরূপ পাঠপদ্ধতির নিন্দা করে বলেন, "বাংলা দেশের মাদ্রাসা-শিক্ষায় এই সাংঘাতিক ত্রুটি অচিরে সংশোধন করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের মৌলভী ও মৌলানারা প্রকৃত 'হাদা-এ-কওম' হইতে পারিবেন না এবং আমাদের বাংলা দেশের ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞানতাও ঘুচিবে না। আশ্চর্যের বিষয় একদল ব্যক্তি যদিও সংখ্যায় নগণ্য, এই সহজ সত্যটি না বুঝিয়া বাংলা দেশে স্বদেশী বাংলার পরিবর্তে বিদেশী উর্দু ভাষা প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি তুর্কি-ঈরাণ, আফগানিস্তান, মালয়-ইন্দোনেশিয়া ও হিন্দুস্তান ইহাদের মধ্যে কেহ কি দেশী ভাষা ত্যাগ করিয়াছে? আমি জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর মধ্যে কোনও সভ্য দেশ তাহার দেশীয় ভাষা ত্যাগ করিয়া বিদেশী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে?" তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতে হলে, ভাবের আদান-প্রদান চালাতে হলে পূর্ব-পাকিস্তানকে উর্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বাংলা শিখতে হবে। ১৯৫৮ সালে ফরহংগে রব্বানী

উর্দু-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় এই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, "উর্দু ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান অনায়াসে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিতে পারেন। মুসলমানের জন্য আর একটি বিশেষ কারণে উর্দু ভাষা শিক্ষণীয়। উর্দু লেখকগণ যেমন বিরাট ইসলামী সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় বাংলায় সেরূপ সাহিত্য এখনও রচিত হয় নাই।...উর্দুভাষিগণ বাংলা শিক্ষা করিলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম প্রমুখ শক্তিশালী লেখকগণের দ্বারা সমৃদ্ধ সাহিত্যেব সহিত পরিচিত হইবেন এবং বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানকে জানিতে পারিবেন।...এই সদ্ভাব ও সমঝোতা পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডের, তথা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

মুসলমানরা শিক্ষায় অনগ্রসর— তাই তাদের শিক্ষা-প্রসারের কথা তিনি চিন্তা করেছেন। কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই যে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সে শুধু মুসলমানদেরই ভালোব জন্য নয়, দেশের দশের সকলের ভালোর জন্যই।" মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষারও তিনি একজন সমর্থক, "শিক্ষা-বিস্তারেব কথায় মেয়েদের বাদ দিলে চলবে না। তারা সমাজের অর্ধেক। তারা আমাদের আধা শরীর। এই আধাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে কখনই আমরা ভাল থাকতে পারিনে।" ছাত্রদের সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, "লম্বা ছুটির সময় তোমরা কি চাষীদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে পার না? স্বদেশ-প্রীতি কি কেবল মুখের কথা হ'য়ে থাকবে? মনে রাখতে হবে যে পর্যন্ত না দেশের সাড়ে পনের আনা এদের অবস্থা ফিরবে, এরা নিজেদের দাবী-দাওয়া কড়া-গণ্ডায় বুঝে নিতে পারবে, সে পর্যন্ত প্রকৃত স্বরাজ হবে না।" ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাতে অন্য অন্য শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি শিক্ষা প্রত্যেকের পক্ষে আমি ফরজ বলেই মনে করি।...কিন্তু ছাত্র-জীবনে রাজনীতি শিক্ষা (political training) এক কথা আর রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া (active participation in politics)

আর এক কথা। এই শেষ জিনিষটায় এমন একটা নেশা আছে, যে তাতে মাতলে আর সব ভুল হয়ে যায়। ছাত্রদের পক্ষে সেটা মস্ত ক্ষতি, দেশের পক্ষে সেটা মস্ত ক্ষতি। মনে রেখো ছাত্রর দল, রাজনীতিতে হাতে-কলমে যোগ দেবার জন্য সমস্ত জীবন প'ড়ে আছে, কিন্তু পড়াশোনার জন্য বেশী সময় নেই।"

দেশের আপামর জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কতিপয়কে শিক্ষিত করে বিরাটতম অংশকে পঙ্গু করে রাখলে জাতীয় উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয়, সকল রকমের শুভ অনুষ্ঠানেব আগে চাই জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার; তা না হলে কোন স্থায়ী মঙ্গল তাদের হ'তে পারে না। রাজনৈতিক উন্নতি বল, অর্থনৈতিক উন্নতি বল, ধর্মসম্বন্ধীয় উন্নতি বল. সামাজিক উন্নতি বল, সকলেরই বুনিয়াদ ঐ জন-শিক্ষা। বুনিয়াদ ঠিক না হ'লে কোনও এমারতই টিকতে পাবে না। পাকা মিস্ত্রী কখনও বুনিয়াদ মজবুৎ না ক'রে উপরের গড়ন শুরু করে না।" জনশিক্ষা প্রসাবের জন্য মসজিদগুলিকেও তিনি শিক্ষাগারে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নমায পড়ার পব খোদার ঘব খালি প'ড়ে থাকে।...প্রত্যেক মুসলমান স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, ছেলে হোক বা বুড়ো হোক, সকলকেই লেখাপড়া শিখতে হবে,— এই যখন ধর্মের বিধান, তখন তার উপায় করতে হবে। মসজিদ ও খতীবেব সাহায্যে এ কাজ হবে। সকালে খতীব ছেলে-মেয়েদের পড়াবেন, সন্ধ্যের পরে অন্য সকলকে পড়াবেন।" ১৯৩৭ সালে চাঁদপুর মুসলিম যুবক সমিতিব অধিবেশনে তিনি খতীবদের ট্রেনিং-দানের কথা বলেছিলেন, "যাতে ক'বে খতীবগুলি শিক্ষাদানের উপযুক্ত হতে পারেন, তার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় খতীব Training মাদ্রাসা থাকা দরকার। এ কাজ খুবই সহজ, কেবল চেষ্টার অভাব।" জনশিক্ষা প্রসারের জন্য সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার খতীবদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন।

দেশ স্বাধীন হলেই স্বাধীন দেশ বলা যায় না— মনে-প্রাণে যদি

স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ না হয় তাহলে সে-দেশের প্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশের মানুষের মনকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার যেমন সংস্কার করতে হবে তেমনি যাঁরা শিক্ষাদান করবেন তাঁদেরও মনের সংস্কার সর্বপ্রথম দূর করতে হবে। তিনি বলেছেন, "খোদাদাদ আযাদ পাকিস্তানে'র সুনাগবিক গঠন করতে হ'লে সর্বপ্রথম কর্তব্য হল ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার ভাব সৃষ্টি করা। এটা একটা নিষ্ঠুর সত্য যে দেশ আযাদ, কিন্তু অনেকেব পক্ষে মন গোলাম। আমি তাকেই স্বাধীন মন বলি, যা সব রকমেব কুসংস্কার-বর্জিত, যা সকল দীনতা-হীনতা থেকে মুক্ত, যা দেশেব মঙ্গলচিন্তায় সদা-ব্যাপৃত, যা দেশের ভাইবোনদের সেবায় উল্লসিত। ছেলেদের এই স্বাধীন মন সৃষ্টি করতে হলে, সর্বাগ্রে শিক্ষকদেব নিজ মনকে স্বাধীন করতে হবে।" কাজেই শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আজ আমাদের মানুষেব চাষ কবতে হবে।...কেবল বহুসংখ্যক লোককে অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট করলেই তাদের মানুষ করা হ'ল না। মানুষের মধ্যে পাশব স্বভাব আছে এবং ঐশ্বরিক গুণও আছে। পাশব স্বভাবকে দমন ক'রে যদি তার ঐশ্ববিক গুণকে ফুটিয়ে তোলা যায় তবেই তাকে প্রকৃত মানুষ করা হ'ল; শিক্ষকেব কাজ এই লেজ-শিং-বিহীন পশুকে মানুষ করা।... মোট কথা শিক্ষককে মনে রাখতে হবে ছাত্রদের পড়াশোনা অপেক্ষা তাদের চরিত্রগঠন শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর ছাত্রদেরও মনে করতে হবে পড়াশোনায় সকলে ক্লাসের first boy না হ'তে পারে, কিন্তু সকলেই চরিত্রে first boy হ'তে পারে।" (ত্রিপুরা জেলা শিক্ষক-সমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ: সেপ্টেম্বর ১৯৪৯)

Man making, Life giving ও Character building—শিক্ষায় এই তিন টিরূপের পরিপূর্ণতা তিনি চেয়েছেন। বাঙলা দেশের শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতির সংস্কার নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অবশ্যই তাঁদের চিন্তাবলয়ে প্রবেশ পাবেন।

স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় ঐতিহ্য উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চলেছিল তার মধ্যে শুধু হিন্দু ঐতিহ্য উদ্ধার হয়েছিল, মুসলমানি ঐতিহ্য উদ্ধারের কোন সবল প্রচেষ্টা আমরা দেখি নি অথচ বাংলা সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি। এজন্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ও অহিংস আন্দোলনে হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চনা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের আরাধনা, গীতাপাঠের আধিক্য লক্ষ্য করেছি। ফলে হিন্দু সংস্কৃতির যতটা ও যেভাবে চর্চা হ'ল সে তুলনায় মুসলমান ধর্মশাস্ত্র, তার সাধু-সন্ত, তার ঐতিহ্যের কর্ষণ হ'ল না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য সেদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করা হয়েছিল, বড় বড় কথার পালিশ অনেক লাগানো হয়েছিল, গোড়াতেই যে গলদ রয়েছে সেদিকে কেউ ফিরে তাকায় নি। এখানেই শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের কাজ করার পালা। মুসলমানদের ঐতিহ্য সর্বসাধারণের গোচরে আনলেন যাতে উভয়েই উভয়ের যোগ্য হয়ে পরস্পরকে চিনে নিতে পাবে। তাঁর কথাতে বলা যেতে পাবে, "একটা ঘোড়া আর একটা গাধা কখনও এক সঙ্গে চলতে পারে না। তাই হয় ঘোড়াকে গাধা হতে হবে, নয় গাধাটাকে ঘোড়া করে নিতে হবে। দৈবের লিখন যে দুইই এক বাঁধনে বাঁধা থাকবে; কেউ কাকে ছেড়ে চলতে পারে না।" (নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯২৮) এইভাবে যদি প্রথম থেকে কাজ করা হ'ত তাহলে হিন্দু-মুসলমানের চেহারা অন্যরকম হ'ত।

মুসলমান সমাজে তিনি দেখেছেন প্রকৃত ধর্ম কি তা তারা ভুলে গেছে — নিজেদের ধর্মের কথা তারা জানে না। সেজন্যে রাজনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুর্‌আন ও ইসলামের ব্যাখ্যা করে তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে তাদের চেতনা জাগ্রত হয়। হযরত মুহম্মদের (দঃ) আদর্শ এবং বর্তমান কালে তাঁর প্রয়োজনীয়তা, তাও তিনি নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা দুটো আলাদা বস্তু। অনেকেই ঐ দুটো বস্তুকে জাতীয়তাবাদের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি এই সংকীর্ণতার তীব্র নিন্দা করেছেন। সত্যান্বেষী যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি ধর্মকে বিচার করেন, ধর্মান্ধতা তাঁর দুচোখেব বিষ। বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র যেমন তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকাবে পড়েছেন তেমনি তাদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির পরিচয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনেছেন। কূপমণ্ডুক হয়ে তিনি কোন কালেই থাকেন নি। বদ্ধ জলাশয় কিংবা চৌবাচ্চার জল যেমন দূষিত হয়ে পড়ে তেমনি তিনিও মনে কবেছেন গণ্ডিবদ্ধ জীবনধারার মধ্যে থাকলে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাব বিকাশ হয় না। সাধুপুরুষ অর্থাৎ খাঁটি পুরুষ হচ্ছে সেই, যিনি নদীর গতিবেগেব মত প্রবহমান। তাই তাঁর সারাজীবনের চিন্তার ফসলে কোথাও একজাতের ধানের চাষ নেই। যেমন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে হজ্জ সমাপন করেছেন (আগস্ট, ১৯৫৫) তেমনি বৃদ্ধ বয়সে নব্য চীনও ভ্রমণ করেছেন (১৯৫৬, ১২ই মে, ৪ঠা জুন)। একদিকে যেমন 'কওমী যবানের কথা' বলেছেন তেমনি অপরদিকে সংস্কৃত ভাষাবও চর্চা কবেছেন। একদিকে যেমন ইসলামীয় আদর্শের কথা বলেছেন অপবদিকে হিন্দুধর্ম বেদ ও গীতার ওপবেও চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। এজন্য কবি জসীমউদ্দীন তাঁর সম্পর্কে একটি কবিতায় বলেছিলেন—

তোমাবে আমবা তসলিম কবি,
হে জ্ঞান-তাপস মুসলমান,
এক হাতে তব বেদ, ভাগবত
আব হাতে তব পাক কোবান।

তাঁব মধ্যে ধর্মবোধ আছে, ধর্মীয় ছুৎমার্গী সংস্কার নেই, নিয়মনিষ্ঠার প্রতি অবিচল আস্থা আছে, ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই কিংবা আত্মগৌরবের গূঢ়ৈষণা নেই। লোকায়ত ধর্মের আবর্জনা অপসারিত কবে ধর্মের সত্যরূপটি তিনি তুলে ধরেছেন। পীরের খাদেমের বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি যে ধর্ম পেয়েছিলেন শিক্ষাদীক্ষার

কষ্টিপাথরে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। কুর্আনে আছে, 'আল্লাহ্ শান্তির নিকেতনের দিকে ডাকেন'। এই আদর্শগত ঐক্যমত বজায় রেখে স্বসম্প্রদায়ের ক্লেদ-মালিন্য দূর করে তাকে ইসলামের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন, তার প্রকৃত ইতিহাস-সংস্কৃতি তুলে ধরে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে তাকে সজাগ করতে চেয়েছেন। আচারের বেড়াজাল থেকে ধর্মকে মুক্ত করে ধর্মের সঙ্গে সমাজের সচেতন সংযোগ রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাঁকে ফুরফুরার পীর সাহেব ধর্মীয় দীক্ষা দেবার অনুমোদন দিয়েছিলেন। তা বলে তিনি পীর-মুরিদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলেন নি। ছাত্ররা যেমন তাঁর কাছে জ্ঞানের পাঠ নিতে আসে তেমনি সভা-সমিতিতে তিনি ধর্মের পাঠ দেন। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে ইসলামের মহান বাণী প্রচারও করেছেন। হিন্দুমিশন, খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম-প্রচার তাঁকে অনেকক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মপ্রচারে অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলামিক সংস্কৃতি ও মুসলিম কৃতিত্বের প্রতি ঐতিহাসিক বোধযুক্ত শ্রদ্ধা তাঁর ছিল। মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে হিন্দুমিশন ও খৃষ্টান মিশনারীদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কল্যাণকর কার্য দেখে আত্ম-রক্ষার তাগিদে তিনিও 'আঞ্জুমান-ই-ইশা আৎ-ই ইসলাম' নামে এক সমিতি গঠন করেন (১৯২৩)। এই সমিতি মুসলমানদের অনেক কল্যাণকর কাজ করেছিল। রাজপুতানার অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর মালকানা মুসলমানদের আর্যসমাজীরা হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত কর-ছিলেন তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশে রাজপুতানা গিয়ে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিরোধ করেন। তাঁর মুখে ধর্মের মহান বাণী শুনে দু'একজন ইসলাম ধর্মগ্রহণও করেছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে তিনি কোনদিন জড়িত ছিলেন না, সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁর কার্যাবলী তাঁর ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত করেছে। এইখানেই তাঁকে অনেকেই ভুল বোঝেন, তাঁকে মনে করেন ধর্মীয় নেতা। নিজ সম্প্রদায় ও ধর্মের প্রতি ভালবাসাকে যদি সাম্প্রদায়িক বলা যায় তাহলে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যিনি এই অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ইসলাম-

ধর্মীয় নেতাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে তিনি আবার 'বিধর্মী'। তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা, জ্ঞানমিশ্রিত যুক্তিনিষ্ঠা তথাকথিত মোল্লা-মৌলবীরা সুনজরে দেখেন না। তিনি তাদের ভণ্ডামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বলেছেন, "ইসলাম আজ যে রূপ নিয়েছে, তাও একটা বাঁধন বই কি। অর্থ বোঝা নাই, কেবল শব্দের আবৃত্তি; অনুষ্ঠান আছে, নাই তার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য; বাহ্যিকতা আছে, নাই আন্তরিকতা। এ সব ভণ্ডামি; এর চেয়ে সাফ নাস্তিক হওয়া ভাল। 'হাফিয, তুমি মদ খাও, নাগরপনা কর, ফূর্তি কর, যাই কর; কিন্তু অন্যের মত কুর্‌আনকে লোক ঠকাবার জাল করো না'।" তিনি তো চোখের সামনে মোল্লা-মৌলবীদের ধর্মের নোংরামি দেখেছেন আর দেখেছেন তারা কিভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে টাকা রোজগার করে। তাদের চিত্ত বিমুখ ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সৌখীন রকমের যোগসূত্র রচনা করতে পারলেই তাদের ব্যবসার কাজ চলে যায়। অন্তরের স্ফূর্তি বশত ধর্মের নিয়মনিষ্ঠা পালন করে না বলে তাদের অন্তরে প্রেম জাগ্রত হয় না। তাঁকে অপদস্থ করার জন্য একাধিক ষড়যন্ত্র হয়েছে, চাকরীজীবনে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদও দেওয়া হয় নি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে তিনি মুসলমান হয়েও উদার মানবতাবাদী— ইসলামের কালোত্তীর্ণ শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ তাঁর চরিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে, যেজন্যে ধর্মের সম্পূর্ণ দিকটা তাঁর কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি কাঠ মোল্লাদের মত ইসলামের খণ্ডিত দিকটাই দেখেন নি, খুচরো পণ্ডিত তিনি নন, সত্যের পূর্ণকুম্ভ তিনি। কে না জানে খালি কলসী বাজে বেশী। সকল যুক্তির ঘাট ঘুরে তিনি তাঁর ধর্মের ঘুঁটিকে 'চিকে' করে নিয়েছেন। তাই তাঁর জীবনের সঙ্গে ধর্মকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না আর ধর্মকে বাদ দিয়ে তিনি থাকতেও পারেন না। জলের সঙ্গে মাছের যে সম্বন্ধ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনে ধর্মের সঙ্গে তাঁর সেই সম্বন্ধ।

প্রকৃত ধর্ম মানুষকে অমানুষ করে না— প্রকৃত ধার্মিক যে সে কোন ধর্মকে ঘৃণা করে না, মানবতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

তাই মনুষ্যত্ব-বিচারে জাতিভেদ নেই। তিনি বলেছেন, "মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ দেখবে না তুমি মুসলমান কি অমুসলমান। সে দেখবে শুধু তুমি কেমন লোক। নিশ্চয় জেন তুমি ভাল লোক না হলে ভাল মুসলমান হতে পার না। শোন নাই কি হযরতের (দঃ) উক্তি? 'তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে ভাইয়ের জন্য তাই ভালবাসবে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে।' 'সেই লোক ভাল যে লোকের উপকার করে'।" বাস্তবিক পক্ষে সর্বধর্মেই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে একটি উচ্চতর স্তব থাকে, তাঁর ধর্মানুভূতি সেই স্তরের বস্তু বলেই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানে তফাৎ নেই। নিজ নিষ্কলুষ সত্যনিষ্ঠ জীবনে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। একারণে যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মসম্মেলনে তাঁর ডাক পড়ে— ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মসমাজ, বৌদ্ধমঠে তিনি ধর্ম-বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা প্রাঞ্জল হ'ত, তার মূলে ছিল তাঁর স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। সংস্কার ও পূর্বসিদ্ধান্ত থেকে মুক্ত হতে না পারলে বুদ্ধি স্বচ্ছ হতে পারে না, কোন জিনিষকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পারলে সহজ করে বলা যায় না। তিনি ধর্মের সমস্ত দিক বিচার করে অখণ্ড সত্যের রূপটি শ্রোতাদের মনে সঞ্চার করে দিতে পারতেন বলেই বক্তব্য এত সরল ও সহজ হ'ত যা সকল শ্রেণীর মন আকর্ষণ করত। তাঁর ধর্মচর্চার আসল কথা সর্ব-ধর্মের মধ্যে ঐক্যসাধন। আমাদের জড়তা ভ্রান্তি দ্বিধা দূব করে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে একটি প্রেমের সাধনায় মেলাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ধর্মের উদ্দেশ্য, ধার্মিক নিজে শান্তি পাবে আর পাবে তার হাতে সমস্ত দুনিয়া শান্তি। যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম নয় পরম অধর্ম। ইসলাম শব্দের দু'টি মানে; আত্ম নিবেদন আর একটি শান্তি স্থাপন।" অন্তরে ধর্মের এই গভীর প্রত্যয় জাগ্রত হলেই প্রেম মুকুলিত হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় "Where Hinduism and Islam Meet" প্রবন্ধে ধর্মের মূল সত্যটি ধরিয়ে দিয়ে শেষে বলেছিলেন, "In conclusion, I should like to

appeal to my Hindu and Muslim brethren···to forget the minor difference of their religions, to feel that after all they are the spiritual children of the Lord of the Universe and to love and respect each other and to live in peace." (November 1933)। এই প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ 'হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলনভূমি' উদ্বোধনের ১৩৪০ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বেরোয়।

ধর্মসাধনার মূলে প্রেম যে অবশ্য প্রয়োজন সে কথা তিনি স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন। জ্ঞানহীন ভক্তির নেশা জাতিকে বহুদিন ধরে পঙ্গু করে রেখেছে। তিনি জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনকেই জীবনের আদর্শ কবেছেন। তাই বর্তমান যুগোপযোগী আলোকে ইসলাম ও কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে ও ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসঙ্গীতের সুর মিলিবে না এবং কেবল তাল কাটিতে থাকিবে।" জড়তা বা ধর্মের নামে যেসব অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে তার বিরুদ্ধেও শহীদুল্লাহ্ লেখনী ধারণ করেছেন। ধর্মের অনুশাসনের দোহাই দিয়ে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি ও নারী-জাতিকে অশিক্ষিত করে রাখার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরুষের সঙ্গে নারীরও সমান অধিকার আছে তা তিনি দেখিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঈদ-বকরিদে পুরুষরা খোলা জায়গায় মিলিত হয়ে নামায পড়ে অথচ মেয়েদের প্রকাশ্য ময়দানে একত্র হয়ে নামায পড়া অধর্মের কাজ বলে মৌলবীরা গণ্য কবতেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব মেয়েদের ঈদের নামায খোলা জায়গায় একত্রিত হয়ে পড়া ধর্মেব বিধান বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং ঐ জামাতে তিনি ইমামের কাজ পালন করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে নামায পরিচালিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে তিনি 'ইসলামে নারীর ধর্ম-সম্বন্ধীয় অধিকার' নামে এক প্রবন্ধ লিখে

সমালোচকদের মুখ স্তব্ধ করে দেন। মসজিদে ময়দানে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও নামায পড়তে পারেন তা তিনি কুর্‌আন হাদীশ থেকে প্রমাণ করেন। তিনি প্রবন্ধের শেষে বলেন, "বর্তমান যুগের উলেমা যাহাই বলুন না কেন, এখনও মুসলিম রাজ্যসমূহে নারীরা পুরুষদের সহিত ইসলামের বিধান অনুযায়ী ঈদের ময়দানে ও মসজিদে নমাযে যোগদান কবিয়া থাকেন।···আজ ইসলামের নব জাগরণের দিনে হযরতের এই লুপ্ত সুন্নত পুনরায় প্রচলিত করার প্রয়োজন আছে। হযরত বলিয়াছেন যে 'আমাব সুন্নতের কোন এক সুন্নতকে, যাহা আমার পরে মৃত হয়, পুনর্জীবিত করিবে, সেও সেই সুন্নতের অভ্যাসকারীদের সমান পুণ্য লাভ করিবে, তাহাদের পুণ্য হইতে কিছুই কম করা [১৮] হইবে না।' তিনি আরও বলিয়াছেন —'যে সময় আমাব উম্মত সুন্নতকে নষ্ট করিয়া দিবে, সেই সময় যে কেহ আমার সুন্নতকে দৃঢ়রূপে ধরিবে, তাহার শত শহীদের পুণ্য লাভ হইবে।" এজন্য তাঁকে ঘরে-বাইরে অনেক কটূক্তি শুনতে হয়েছে কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি, কেননা ধর্ম তাঁর কাছে একদিকে জীবনচর্চা অপরদিকে অধ্যাত্মচেতনার সোপান। সেখানে নারী-পুরুষে কোন ভেদ নেই।

আচার'সর্বস্ব ধর্মই জীবনে ভার হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে"। প্রেমহীন ধর্ম মানুষকে হিংস্রতার পথে চালনা করে, জ্ঞানহীন ধর্ম পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবকে ব্যথিত করে, কেননা ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ বোঝে না। ধর্মের সত্যরূপটি উভয় সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরে বলেন, "এই যে ঝগড়া-বিবাদ একে আমি ধর্মের জন্য ঝগড়া বলি না। এমন কোন কথা হিন্দুর বেদ-পুরাণে নেই যে এক মিনিটের জন্য মসজিদের সামনে বাজনা থামালে, তাঁদের ধর্মকর্ম পণ্ড হ'য়ে যাবে। এমন কথা মুসলমানের কুর্‌আন-হদীসে

নেই যে বিধর্মী মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে মুসলমানের ঈমান নষ্ট হ'য়েযাবে।" দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তৃতীয় পক্ষই লাভবান হয়। পরাধীন ভারতে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় স্বাধীনতার যুদ্ধ পিছিয়ে যায়, তাই তিনি সেদিন সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে তরুণ সমাজকে ডাক দিয়েছিলেন, "ঝগড়া বিবাদে শক্তি নষ্ট না ক'রে যত ভারতসন্তান একপ্রাণ হয়ে স্বরাজ্য সাধনা কর।···আমি শুধু বলি এই ঝগড়ায় তোমাদের স্বরাজ এগুচ্ছে না পিছুচ্ছে। পুনরায় বলি এ ধর্ম নয়, এ পরম অধর্ম। এখন হিন্দু মুসলমানকে বুঝা চাই—

'তুই পল্‌শে, মুই খল্‌শে, একই বিলেব মাছ।
তোব মবণে আমাব মরণ, কাঁকাল ধরে নাচ॥'

খোদার মবযি হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন বৌদ্ধ পার্শী খৃষ্টান সব এদেশে বাস করবে। কেউ কাকেও দূর করতে পারবে না।"

ধর্মান্ধতা দূর করতে হলে শিক্ষাবিস্তার করতে হবে। তিনি বলেছেন, "সকল কাজের উপর শিক্ষাবিস্তার। মূর্খ জাতির কোন ধর্ম নাই, কর্ম নাই; উদার শিক্ষাব সঙ্গে উদার ধর্মের সম্মিলন এই-ই চাই।" (প্যারীর পত্র)। ধর্মজীবন, নৈতিক জীবন সমাজজীবন এই তিন সত্তাকে মিলিত কবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের আদর্শ তাঁর ধর্ম-চিন্তার মূল সূত্র। এই আদর্শকে রূপায়িত করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষার দরকার। তাই মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বার বার আবেদন জানিয়েছেন। পরকালের জন্য শুষ্ক ধর্মচর্চা তিনি চান নি। অর্থহীন উপকরণ সমাজকে জরাগ্রস্ত করে তোলে। চাঁদপুর মুসলিম যুবক-সমিতির অধিবেশনে যুবকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "আমি মনে করি দেশেব সর্বপ্রথম কাজ মূর্খতারূপ মহাশত্রুর সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করা।··প্রত্যেক মুসলমান স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, ছেলে হোক বা বুড়ো হোক, সকলকেই লেখাপড়া শিখতে হবে— এই যখন ধর্মের বিধান তখন তার উপায় করতে হবে।"

দেখা গেল, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ধর্মচিন্তা উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার

নয়, ইহা জাতিধর্মনির্বিশেষে ধর্মের মাধ্যমে মানুষের চিৎ-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, সত্যানুসন্ধানে ব্রতী করা। নিজ জীবনের মহৎ আদর্শ ও নিজ কর্মের সার্থকতা দিয়ে তিনি একথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুর্‌আন শরীফের সুরা 'আল ইমরানে' আছে, "তোমাদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় থাকবেন যাঁরা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি আহ্বান করবেন, শোভন কাজ করতে উপদেশ দেবেন, অশোভন কাজ হতে বিরত থাকতে বলবেন।" শহীদুল্লাহ্ সাহেব সেই বিরল সম্প্রদায়ের একজন যিনি মানবসমাজকে শুভকর্মপথে নির্ভয়ে গান ধরার আহ্বান জানান, যাঁর ধর্ম-সংস্কৃতিমূলক চিন্তারাজীর মধ্যে মানবতাবাদী চেতনার শুভ শঙ্খধ্বনি শোনা যায়।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জীবন ও সাহিত্যচর্চার মধ্যে বাঙলা সংস্কৃতি, ঐসলামিক ঐতিহ্য ও আধুনিক মানবতাবাদী তথা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য—এই তিনের সমন্বয়ী রূপ দেখতে পাই। তাই তাঁর সমস্ত রচনার উৎসমূলে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম। জাতীয়তাবাদী নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ও সমন্বয়ের স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখেছেন, সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন। বাঙালীর জীবনধারা, ঐতিহ্য ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধের প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকার নামই ছিল 'বঙ্গভূমি'—বাঙলাদেশের প্রতি এটিও তাঁর অনুরাগের আর একটি উদাহরণ। তিনি সারাজীবনের চিন্তার বেশীর ভাগ ফসল বাংলাভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেছেন, মাতৃভাষায় গবেষণার যে মান তিনি তুলে ধরেছেন তাতে বাংলা সমৃদ্ধ হয়েছে। বাঙলা ভাগ হয়ে গেলেও বাঙালী এবং বাংলা সাহিত্য এক ও অখণ্ড, এ ধারণা তাঁর বদলায় নি। 'পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিকদের নাম একত্রে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দানের শেষ অংশে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলাভাষাকে বিশ্বের দরবারে উচ্চ স্থানের অধিকারী করিয়াছে। পাক-ভারত উপমহাদেশের দুইটি বিশিষ্ট প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রতিভা ইহাকে একটি বিশ্বভাষায় (World Language) পরিণত করিবে।" পূর্ব-বাঙলায় বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষাকল্পে বাঙালী তরুণরা শহীদ হয়েছিলেন (১৯৫২, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী)। সেই সংগ্রামকে তিনি সমর্থন তো করেছেনই, উপরন্তু তাকে ধর্মবিশ্বাসের (ঈমান) লড়াই বলে মনে করেছেন। কারণ তাঁর কাছে তাঁর নিজের কথাতেই "মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি—এই তিনটিই প্রত্যেক

মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু"। (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫১)। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই নিজের শ্রদ্ধা জাতির মনেও সঞ্চার করে দিয়েছেন। তাঁর সারাজীবনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চায় কোন দান যদি কেউ খুঁজে না পান তাহলেও মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগানোর এই মহৎ কর্মে তাঁর প্রচেষ্টা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পূর্ব-বাঙলার তরুণ সমাজ তাঁর এই দানের কথা সতত স্মরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন—

: তোমার জ্ঞানের শিখা অনির্বাণ জ্বলে। হৃদয়ের
সর্বলোক আলোকিত হল তার স্নেহস্পর্শ পেয়ে।
শুনেছি তোমার মুখে : মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, মাতা
প্রাণের অধিক প্রিয় এবং সত্যের পথ শ্রেষ্ঠ
চিরকাল। আজ সেই পণ দেখি কোটি কোটি চোখে
প্রদীপ্ত। তোমার দীপ জেলে যায় প্রাণ থেকে প্রাণে
আলোর অমৃতধারা, যার পটে অনন্ত সত্যের
দোলে রূপ : আত্মার দর্পণে তার সাহসী উন্মেষ।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান বাংলা-সাহিত্য সম্মেলনে (১৩৫৫, পৌষ : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮) মূল সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে বাঙালীর মর্মকথা এমন নির্ভয়ে ও সুন্দরভাবে নিবেদন করেছেন যেটি আমাদের সকলের প্রণিধানযোগ্য—

: যেমন আমরা বাংলায় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান এক মিশ্রিত জাতি, আমাদের ভাষা বাংলাও এক মিশ্রিত ভাষা।…আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষাব ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোনও স্থান নেই।

ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। এক দল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর এক দল বাংলাকে আরবী-পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। এক দল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।

নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি। এক-

মাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (style) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না।···মানুষে মানুষে যেমন তফাৎ, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি (style) হওয়া চাই স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ও মধুর।···আমাদের দুটি কথা স্মরণ রাখা উচিত—ভাষা ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাবগোপনের জন্য নয়; আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য, গোঁড়ামি নয়।

···স্বাধীন পূর্ব বাঙলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ব বাঙলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হ'ত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে। অধিকন্তু আরবীতে এতগুলি নতুন অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে যে বাংলার বাইরে তা যে কেউ অনায়াসে পড়তে পারবে, তা বোধ হয় না।··

···এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্যে, জ্ঞানে গুণে, শিল্প-বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে-কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষার মাধ্যম স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড়া বাংলা করতে হবে।

তাই বাঙলাদেশের শিক্ষা-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ সাহেব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছেন— তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, দেশ-হিতৈষিতা, উন্নত জীবনাদর্শ তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এধারে বাঙালী হিসেবে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ বিভাগ পরবর্তী বংশধরদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব থেকে কর্তব্যচ্যুত হয়েছেন। এজন্যে এধারের বাঙলায় আজ তাঁর নাম অবলুপ্তির পথে। টি. এস. এলিয়ট বলেছিলেন, সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষা করবে মুষ্টিমেয় আত্মমগ্ন প্রাজ্ঞজন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উভয় বাঙলার সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যাপারে মুষ্টিমেয় আত্মমগ্ন প্রাজ্ঞজনের মধ্যে বিশিষ্ট জন।

পরিশিষ্ট

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র গ্রন্থপঞ্জী

শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন, বহু সভা-সমিতিতে তিনি ভাষণ দিয়েছেন, তার শতাংশের মাত্র একাংশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং কয়েকটি গ্রন্থ যন্ত্রস্থ অবস্থায় আছে। তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়েব ইংবেজী প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে ডঃ আনওয়াব দীলের সম্পাদনায় বেরুবার কথা আছে। তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ ও ভাষণগুলি সংগ্রহ করে অনায়াসেই আরও ৮।১০ খানা মোটা মোটা বই বের করা যেতে পারে। এছাড়া তিনি প্রচুর স্কুলপাঠ্য বচনা করেছিলেন যার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে তাঁর মৌলিক রচনা আছে, সেগুলিও আজ অবলুপ্তিব পথে। তাঁর স্কুলপাঠ্য রচনাগুলি বিস্মৃতিব হাত থেকে উদ্ধার করা এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদি গ্রন্থাকারে সন্নিবিষ্ট করা আশুকর্তব্য, কেননা তাঁর প্রবন্ধাদিতে তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফসল ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধাদি গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হলে সেগুলি জাতিব মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে। মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্‌ সাহেব একক চেষ্টায় পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন কিন্তু তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, এবিষয়ে তাঁকে সহায়তা করার জন্য আরও লোকের সহযোগিতা প্রয়োজন। এদিকে যত্নবান ও আগ্রহশীল হওয়ার জন্য উৎসাহী প্রকাশক ও তাঁর গুণমুগ্ধদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ক. ভাষা ও সাহিত্য ঃ

১. ভাষা ও সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ— ১৭শে মাঘ, ১৩৭৮ [১৯৭১]। দি ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ [।০] + ১২৭।

সূচী— আমাদের ভাষা সমস্যা। আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা। বাংলা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ। সাহিত্যের রূপ। সাহিত্যের রূপ (২)। পল্লী সাহিত্য। আমাব কাহিনী ফুরুলো। বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ। গোত্রভিদ-ইন্দ্র। বাঙ্গালা বানান সমস্যা। বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ। বাঙ্গালা ভাবায় একারের বক্র উচ্চারণ। বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ। ভাবতের সাধারণ ভাষা। বাঙ্গালী জীবনে মুসলমান প্রভাব।

২. **বাঙ্গালা ব্যাকরণ**। প্রথম প্রকাশ—১৩৪২ [১৯৩৫]। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। ত্রয়োদশ সং ১৩৬১। পৃঃ ৪৪২।

৩. **ইক্‌বাল**। প্রথম প্রকাশ—১৯৪৫। পরিবর্ধিত নতুন সং—জুন, ১৯৬৪, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১; মুহর্রম, ১৩৮৩। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

উৎসর্গ—পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাঙ্গালা আবুল কাসেম ফজলুল হক হিলাল-ই-পাকিস্তান সাহেবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। পৃঃ [৮]+১৪৪।

'আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল পাকিস্তানের জাতীয় কবি। আমি এই পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে হইলেও পূর্ণভাবে আলোচনার প্রয়াস করিয়াছি।' (মুখবন্ধ: ১৪. ৮. ৫৮ ইং)।

'আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল পাকিস্তানের পবিকল্পক। কাইদ-ই-আযম তাহার রূপকার ও ভিত্তিস্থাপক। এই পাকিস্তানের জগন্মোহন গগনচুম্বী সৌধ রচনায় ইকবালের পরিকল্পনার অনুসবণ অপরিহার্য। আমি এই নূতন সংস্করণে তাঁহার ভাবধারার একটি যথাসম্ভব সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি।' (নূতন সংস্করণের ভূমিকা: ১১. ৬. ৬৪ ইং)।

সূচী—ইক্‌বাল। ইক্‌বালেব গ্রন্থপরিচয়। ইক্‌বালের বাণী। ইক্‌বাল দর্শনে খোদা-তত্ত্ব। ইক্‌বাল ও নবীপ্রেম। ইক্‌বালের জীবনদর্শন। তারানা-ই-মিল্লী। মুনাজাত।

৪. **আমাদের সমস্যা**। প্রথম প্রকাশ—আগস্ট ২১, ১৯৪৯। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। পৃঃ ৮৪।

সূচী—আমাদেব ভাষা সমস্যা। বাংলার মুসলিম সাহিত্য ও তাহার বাহন। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা। আমাদের সাহিত্য। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা। পুব পাকিস্তানের শিক্ষাব ভাষা সমস্যা। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসার শিক্ষা সংস্কার। বাংলা বানান ও অক্ষর সংস্কার। 'শোজা বাংলা'। আরবী হরফে বাংলা ভাষা।

৫. **বাংলা সাহিত্যের কথা**। প্রথম খণ্ড: প্রাচীন যুগ। প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৫৩। পবিমার্জিত সং—কার্তিক, ১৩৭৩। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

উৎসর্গ—অগ্রজপ্রতিম পরমশ্রদ্ধাভাজন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে। পৃঃ [৮]+১৮৩।

'আমি ১৯১৯ ইং সাল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত আছি। এই সম্বন্ধে আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ বিবিধ পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিকে সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু নূতন রচনা সংযোগ করিয়া এই 'বাংলা সাহিত্যের কথা' প্রকাশিত হইল।

বিভিন্ন সময়ের লেখা বলিয়া প্রবন্ধগুলির মধ্যে রচনা-রীতির পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কিন্তু উপায় কি ?' (প্রথম সংস্করণের নিবেদন : ২০. ৪. ৫৩ ইং)।

সূচী— বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কত দিনের ? প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা। নাথপন্থা। নাথ গীতিকা— ক. মীননাথ ও গোরক্ষনাথের জীবনকথা, খ. জালন্ধরীপা ও কানুপার বৃত্তান্ত, গ. মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর বৃত্তান্ত, ঘ. গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ঙ. চৌরঙ্গীনাথের কথা। নাথসিদ্ধাগণ— মীননাথ-কানুপা-গুরু কৃষ্ণচারীর ইতিহাস-চৌরঙ্গীনাথ। তান্ত্রিক বৌদ্ধমত বা সহজযান— শবরীপা-লুইপা-বিরূপা-ডোম্বিপা-ভুসুকু, অবশিষ্ট বৌদ্ধতান্ত্রিক লেখকগণ— কুর্মীপা-কম্বলাম্বর-আর্যদেব-কঙ্কণ-মহীধব-ধর্মপাদ-ভদ্রপাদ-জয়নন্দী-শান্তিপাদ-বীণাপাদ-সরহ-দারিকপাদ। চর্যাগানের সাহিত্যিক মূল্য। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার সমাজ-চিত্র। বৌদ্ধগানের ভাষা : চর্যাপদের ব্যাকরণ— চর্যাপদের ছন্দ। ধর্মপূজা। ধর্মসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব : শূন্যপুরাণ ও তাহার লেখক। ধর্মমঙ্গল : ধর্মমঙ্গলেব হরিশ্চন্দ্র পালা-ময়ূরভট্ট-লাউসেনের কাহিনী। লোকসাহিত্য : কাজলরেখা— শীত ও বসন্ত — 'আমাব কাহিনী ফুরুলো' — ব্রতকথা, ছড়া, ডাক ও খনার বচন—হিঁয়ালী-প্রবাদ বাক্য। গ্রন্থপঞ্জী। নাম নির্ঘণ্ট। (পরিমার্জিত সংস্করণের সূচী অনুসারে)।

৬. **বাংলা সাহিত্যের কথা**। দ্বিতীয় খণ্ড : মধ্যযুগ। প্রথম প্রকাশ—মার্চ, ১৯৬৫। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

উৎসর্গ— যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 'Shahidullah, bar is not for you, come to University' বলে আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করে আমার জীবনের গতিপথ বদলিয়ে দিয়েছিলেন সেই পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমব নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল। পৃঃ [১০]+৫৩৩।

সূচী— মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি : ক. পাঠান আমল ১২০১-১৫৭৬, খ. মোগল আমল ১৫৭৭-১৮০০। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ধারা। বড়ু চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস সমস্যা। শেখ কবীরের একটি পদ ?। মুসলমান পদকর্তৃগণ। হিন্দু-পদকর্তৃগণ। বিদ্যাপতি। কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে ?। শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর। গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা। ময়নামতীর গান। মহাকবি সৈয়দ সুলতান ও কবি মুহম্মদ খান। মহাকবি আলাওল। মধ্যযুগের কাব্যের উপজীব্য আখ্যান—মনসামঙ্গলের কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী—কাল-কেতুর উপাখ্যান, ধনপতি সওদাগরের কাহিনী, বিদ্যা ও সুন্দরের কাহিনী, সত্য-

পীরের কাহিনী, হিন্দু উপাখ্যান, মুসলমানী উপাখ্যান। মনসামঙ্গলের কবিগণ, কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, কেতকীদাস ক্ষেমানন্দ, ক্ষেমানন্দ, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, বাণেশ্বর রায়, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, বিষ্ণু পাল, বৈদ্য জগন্নাথ, দ্বিজ রসিক, রাজসিংহ, জানকীনাথ, গোপালচন্দ্র মজুমদার, অন্যান্য কবিগণ—জগমোহন মিত্র, দ্বিজ কালীপ্রসন্ন, বৈদ্যনাথ, রাধানাথ রায় চৌধুরী। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ—মাণিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন, হরিরাম, ভারতচন্দ্র রায়, জয়নারায়ণ, ভবানী শঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ—আদি রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, রূপরাম, শ্যামপণ্ডিত, সীতারাম দাস, রামদাস আদক, দ্বিজ প্রভুরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, হৃদয়রাম সাউ, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, শঙ্কর চক্রবর্তী, রামকান্ত রায়, লক্ষ্মণ, ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিগণ। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কবিগণ—কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর, রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র রায়, নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন, দ্বিজ রাধাকান্ত, কবীন্দ্র, মদন দত্ত। সত্যপীরের পাঁচালীর কবিগণ। মঙ্গলকাব্য—বাশুলী মঙ্গল, শীতলামঙ্গলের কবিগণ, শীতলামঙ্গলের উপাখ্যান, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, বিবিধ মঙ্গল কাব্য, পীরমঙ্গল, গাজী ও কালু, মাণিক পীর, পীর গোরাচাঁদ, একদিল শাহ, মোবারক গাজী, শাহ্ সুফী সুলতান, অন্যান্য পীর। চৈতন্য সাহিত্য—চৈতন্যদেব, জীবনচরিত, বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দদাসের কড়চা। মুসলমানী পুঁথি-সাহিত্য, পুঁথি-সাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ, শাহ, ইউছুফ জোলেখা, জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি, সৈয়দ হামযা, মধুমালতী, আমীর হামযা, জৈগুনের পুঁথি, হাতেম তাই। অনুবাদ সাহিত্য—আরবীর অনুবাদ: নবীবংশ, কিফায়তুল মুসল্লীন, কায়দানি কিতাব, নসলে ওসমান ইসলামাবাদ বা শাহনামা, দাকাইকুল হকাইক, সা, আতনামা; ফারসীর অনুবাদ: যুসুফ যুলায়খা, লায়লী মজনু, আলাওল অনূদিত ফারসী গ্রন্থ, আমীর হামযা, আবদুল হকীম অনূদিত ফারসী গ্রন্থ, ফিকরনামা, গুলে বাকাউলি, মূসার সাওয়াল, দুল্লা মজলিস, তুতিনাম গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর অনুবাদ, শাহ্ পরীর কিচ্ছা, মল্লিকা যাদার পুঁথি, শ্রীনামা, মওতনামা, হয়রাতুল ফিক্‌হ, সিরাজ কুলুব, হাতেম

তাই, বাঙ্গালায় ফারসী প্রভাব ; উর্দু-হিন্দীর অনুবাদ ঃ মনোহর মধুমালতী, সতীময়না-লোর-চন্দ্রাণী, মৃগবতী, পদ্মাবতী, পদ্মাবতী উপাখ্যান, আলাওলের পদ্মাবতী উপাখ্যান, আলাওলের পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ, সুলতান জমজমার পুঁথি, বাহু হসন বাহরাম গোর, বেনযীর বদবে মুনীর, আবু সামার পুঁথি, রেজওয়ান শাহ্, জৈগুনের পুঁথি, ভক্তমাল, বাঙ্গালা ভাষায় উর্দু-হিন্দী প্রভাব ; সংস্কৃত হইতে অনুবাদ ঃ রামায়ণ, কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, অন্যান্য রামায়ণ অনুবাদকগণ, মহাভারতের অনুবাদ, শ্রীকরনন্দী, কাশীরামদাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, অন্যান্য মহাভারতরচকগণ, বিবিধ মহাভারত পর্ব অনুবাদ, অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ, ভাগবত, অন্যান্য ভাগবত রচকগণ, অন্যান্য কৃষ্ণলীলা রচকগণ, অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব। লোকসাহিত্য ঃ মহুয়া, পাঠ আলোচনা, ভেলুয়া সুন্দরী, পাঠ আলোচনা, লোক সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের নারী, গীতিকারগণ, বারমাসী, ফুল্লরার বারমাস্যা, জৈগুনের বারমাসী, শিশু-সাহিত্যের বারমাসী। খণ্ডকাব্য-চৌতিশা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান, ধর্মীয় কাব্য, রোমান্টিক কাব্য, ইতিকাব্য, গীতিকাব্য, বারমাসী ও চৌতিশা, বিবিধ রচনা। গ্রন্থপঞ্জী। নির্ঘণ্ট।

৭. **বাঙ্গালাভাষার ইতিবৃত্ত**। প্রথম প্রকাশ—১৯৫৯। বাংলাবিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৬৫। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। পৃঃ ২০২।

সূচী—উপক্রমণিকা : বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ হিন্দ-য়ুরোপীয়ন মূল ভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত ক্রমিক ধারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত— সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা, মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা, গৌড়ী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা, গৌড় অপভ্রংশ, নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের সহিত বাঙ্গালার সম্পর্ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের প্রাচ্য শাখা—প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহের তুলনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য প্রভাব, বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব —১। ধ্বনিতত্ত্ব, ২। রূপতত্ত্ব, ৩। পদক্রম (syntax), ৪। শব্দকোষ, ৫। উপসংহার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ বৈদেশিক প্রভাব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বাঙ্গালার উপভাষাসমূহ—পাশ্চাত্ত্য উপভাষা, প্রাচ্য উপভাষা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ স্বরাঘাত।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন—উদ্বৃত্ত স্বর, উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ, উদ্বৃত্ত স্বর মিলিত হইয়া সন্ধিস্বর, প্রাচীন ভারতীয় ঋ ও ৯ পরিবর্তন, স্বতোনাসিক্যভবন : চন্দ্রবিন্দু-আগম, সাধারণ অনুনাসিক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন—অনাদি স্থানে, যুক্তাক্ষর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ কারক-বিভক্তির ইতিহাস—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ; বহুবচনের কারক—কর্তৃকারক, কর্মকারক, সর্বনাম (দ্বিবচন লোপ), উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ, সংখ্যাবাচক শব্দ, ভগ্নাংশ সংখ্যা, পুরণবাচক শব্দ, ক্রিয়াপদ, ধাতুরূপের গণ, অশোকলিপিতে আত্মনেপদী ক্রিয়াপদ (নির্দেশভাব), বর্তমানকালের নির্দেশভাব (Indicative Mood), বর্তমানকালের আদেশভাব (Imperative Mood), সামান্য অতীত, নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ামূল (Bases), ক্রিয়াবিভক্তি (Personal endings); উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ, কয়েকটি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ; আছ্ ধাতু, বট্ ধাতু, রহ্ ধাতু, যা ধাতু, লে ধাতু, দে ধাতু, আস্ ধাতু; বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয় : ভাববাচ্য, কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, করণ-বাচ্য, অধিকরণবাচ্য; বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয় (Secondary Suffixes): সর্বনামের সহিত, স্ত্রী-প্রত্যয়, কর্মবাচ্য, প্রযোজক ক্রিয়া (Causative Verb), শব্দাবলী (Vocabulary), বাক্যরীতি (Syntax), প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনির ক্রম-বিবর্তন, অশোকলিপিতে যুক্তাক্ষর, স্বতঃউৎপন্ন অনুনাসিক, স্বতঃউৎপন্ন মূর্ধন্যীভবন।

৮. **বাংলা আদব কী-তারিখ**। প্রথম প্রকাশ—১৯৫৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উর্দুভাষীদের জন্য বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১—১৭৯। প্রাচীন ও মধ্য যুগ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের রচিত এবং অপরার্ধ আধুনিক যুগ সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ আবদুল হাইর রচিত। বাংলা ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি থেকে মৌলভী আবদুর রহমান বে-খুদ্ কর্তৃক অনূদিত। ডক্টর সাহেবের রচিত

বাংলা ভাষায় মূল পাণ্ডুলিপি এখনও অপ্রকাশিত কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—আধুনিক যুগ প্রকাশিত হয়েছে, সেটি সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ আবদুল হাইর রচিত।

৯. **Les Chants Mystiques de Kahna at de Saraha** | First Published—1928 | Ardien Maisonneue, Paris | Dedication— Abu Raihan-al-Biruni |

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Docteur de l' University de Paris ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণা-গ্রন্থ। তিব্বতীয় অনুবাদের সাহায্যে কাহ্নপাদ ও সবহপাদেব দোহাকোষের মূল পাঠ নির্ণয় এবং অপভ্রংশ ভাষা ও সহজযান সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা-সম্বলিত ভূমিকা।

১০. **Les Sons du Bengalie** | Paris, 1928 |

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Diplo-Phon. উপাধির জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণা-প্রবন্ধ। বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা। (অপ্রকাশিত)।

খ. ধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ

১. **হজ্জের ও রওযাঃ পাকের যিযারতের দো'আ দরূদ**। প্রথম প্রকাশ—১৯৫৭। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। পৃঃ ৬৪।

২. **শেষ-নবীর সন্ধানে**। প্রথম প্রকাশ—রমযান, ১৩৮০ ; ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; মার্চ, ১৯৬১। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। উৎসর্গ—ওয়ালিদাইন মর্হুমাইনের রূহানী সওয়াব রিসানীর উদ্দেশে। পৃঃ [৮+২০]+১০০।

বিশ্বের শেষ-নবীর (দঃ) জীবনবৃত্তান্তে কতকগুলি সমস্যা আছে। আমি এই পুস্তকে সেইগুলির সন্ধান ও সমাধান দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে মতভেদের অবসর আছে। আমার সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের মূল্যবান মতামত জানাইলে আমি বাধিত হইব। আমি জানি 'আল্ ইনসানু মুরক্কবুম্ মিন-ল্ খতাই ওঅ-ননিসিয়ান'—মানুষ ভুলত্রুটির অধীন তবুও সত্যের সন্ধান প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। সেইজন্য আমার এই প্রয়াস। বর্তমানে শুধু মক্কার ঘটনাবলীর উপর বিশেষভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি। ভবিষ্যতে ইন্‌শাল্লাহ মদীনার জীবন লইয়া সম্পূর্ণভাবে রসূলুল্লাহের (দঃ) জীবনী আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। (ভূমিকা : ২১শে রমযান, ১৩৮০ হিজরী)।

সূচী—প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ-নবী (দঃ)। শেষ-নবীর (দঃ) জন্ম।

নবুওত প্রাপ্তি ও শবে কদর। শবে মি'রাজ। আকাবার প্রথম অঙ্গীকার 'শক্কুল কমর' বা চন্দ্র বিদারণ। পরিশিষ্ট: ক. হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত ও ঘটনাবলী ; খ. মূল আরবী উদ্ধৃতি। নির্ঘণ্ট।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ-নবী (দঃ)' পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। পরে এটি বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

৩. **মুহর্‌রম শরীফ**। প্রথম প্রকাশ—১৯৬২। আঞ্জুমানে ইশ'আতে ইসলাম, ঢাকা।

৪. **রোযাহ্, ঈদ ও ফিতরাঃ**। প্রথম প্রকাশ—১৯৬৩। আঞ্জুমানে ইশ'আতে ইসলাম, ঢাকা।

৫. **ইসলামপ্রসঙ্গ**। প্রথম প্রকাশ—১৯৬৩। রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা।

উৎসর্গ—যাহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নে বিক্ষিপ্ত বিস্মৃত পত্রিকাসমূহের পত্রান্তরাল হইতে এই পুস্তক আত্মপ্রকাশ করিল, সেই পরম কল্যাণীয় প্রাণাধিক আবুল ফযল মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় এই পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইল। পৃঃ [৪]+১৩৯।

সূচী—কসীদাঃ গওসিয়া (আরবী ভাষায় হযরত বড পীর সাহেবের রচিত গ্রন্থের কাব্যানুবাদ)। ইসলাম ও বিশ্ব-সেবা। ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার। ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা। জাতির উত্থান ও পতন। মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারী-কল্যাণ। ইসলামে রাষ্ট্রের স্বরূপ। ইসলামী সমাজের রূপ। নীতিব মূলসূত্র—পুণ্য পাপ ও অপরাধ। আমাদের শিক্ষা সংস্কার। ইসলাম—মানবতার মুক্তি-দূত। জগতের আদর্শ মহামানব। হযরত মুহম্মদের (দঃ) ধর্মীয় উদারতা। সত্যের সংগ্রামে মহানবী (দঃ)। মহানবীর (দঃ) উদারতা। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)। হযরত আবদুল কাদির জীলানী (রাঃ)। ইসলাম-প্রচারে হযরত শাহজালাল মুজর্‌রদের (রাঃ) ভূমিকা। হযরত নূরুদ্দীন নূরুল হক কুতুবুল আলম (রঃ)। বাঙ্গালী ফারসী কবি সূফী ফৎহ আলী (রঃ)। হযরত শাহ্ সূফী মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী (রঃ)।

৬. **Essays on Islam** | First Published—1945 | p. 118.

Contents—The Need of Religion. The Mission and the Message of the Prophet of Arabia, the Religion of Peace. Non-violence in Islam. The Highest Good According to the Quran. Napoleon on Islam. God and Man.

৭. **Traditional Culture in East Pakistan | First Published—1963 | Department of Bengali, University of Dacca | p. 191.**

A survey under the auspices of UNESCO with co-author Prof. Mohammad Abdul Hai.

Contents—Introduction—Traditional Culture in East Pakistan, Folk Dances, Folk Music, Folk arts, Crafts, Importance of Traditional Culture in the life of communities and its preservation and revitalization. (Dr. Md. Shahidullah)

Folk Songs and Folk Literature, Indigenous Games and Sports (Prof. M. A. Hai).

৮. **কুর্‌আন প্রসঙ্গ।** কুর্‌আন শরীফের বিষয়সম্পৃক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সংকলন অচিরে প্রকাশিতব্য।

গ. অনুবাদ ও আলোচনাঃ

১. **দীওআন-ই-হাফিয।** প্রথম প্রকাশ—১৯৩৮। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। দ্বি-সং—১৯৫৯। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। পৃঃ [৮+২।০+৪]+৬২।

'দীর্ঘকাল পরে "দীওআন-ই-হাফিযে"র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ব্যয় সংক্ষেপের জন্য মূল পারসী অংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। অনুবাদ সম্বন্ধে আমার নীতি জ্ঞাপন করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। অনুবাদ হইবে মূলের প্রতিচ্ছবি। তবে ছন্দের অনুরোধে যথাসম্ভব সামান্য বাচনিক পরিবর্তন অপরিহার্য হইতে পারে। কিন্তু মূলের ভাবের পরিবর্তন আমি দূষণীয় মনে করি। এই নীতি অবলম্বন করায় হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণের ন্যায় কাব্য-শক্তির সম্পূর্ণ স্ফুরণ সম্ভবপর না হইলেও অনুবাদের বিশ্বস্ততার অনুরোধে অনুবাদক ক্ষমার্হ।' (মুখবন্ধ : ২৩. ৬. ৫৯ ইং)।

সূচী—ভূমিকা। হাফিযের জীবনী, গযল কবিতা। দিওআন: ১. সাকী ২. সুন্দর ৩. হৃদয় আমার হাত ছেড়ে যায় ৪. পিয়ালা ৫. তুর্কিবালা ৬. বাঁশীর সুর ৭. যৌবনের রঙ ৮. বিচিত্রা ৯. মিলন ১০. বেহেশ্‌ত ও দোযখ ১১. আশার রংমহল ১২. দরবেশ ১৩. মস্ত ১৪. শ্যাম-সখা ১৫. সখার দোরে ১৬. ঈদ-রাতে ১৭. ফুল-কলি ১৮. গোলাপ-বালা ১৯. যদি ফের আসে ২০. নয়ন-তারা ২১. দোর তোদেরি খুলবে ২২. অচিন প্রিয়া ২৩. জল হৃদয় ২৪. দর্শন ২৫. শরাবের খুরি ২৬. প্রেমের

জন্ম ২৭. নয় রে সমান ২৮. সন্ধান ২৯. রবে না ৩০. আজ শেষ ৩১. সেয়ান ৩২. জমশেদের পেয়ালা ৩৩. সখা ৩৪. সাকীর মুখ ৩৫. প্রেম ৩৬. ত্রাণকারী ৩৭. শরাব ৩৮. স্মরণে ৩৯. কি দরকার? ৪০. ক'রো না শোক ৪১. বন্ধু, ৪২. নিবেদন ৪৩. বোরকা ৪৪. প্রিয়ার পথে ৪৫. জ্যোতি ৪৬. প্রেমের গোলাম ৪৭. শেষ দিনে ৪৮. কলি যুগ ৪৯. কোপনা ৫০. তাজা তাজা ৫১. পত্র ৫২. আঁখির আলো ৫৩. মস্তান ৫৪. গোলাপী সুরা ৫৫. একটু ফুরসৎ ৫৬. ভোরের বুলবুল ৫৭. মন-চোরা ৫৮. প্রেম ৫৯. বন্দী পাখী, ৬০. নও রোযে। আরবী-পারসী শব্দসূচী।

২. **শিক্‌ওয়াহ্‌ ও জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌** (নালিশ ও নালিশের জবাব)। মূল: আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল। প্রথম প্রকাশ—১৯৪২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পরিবর্তিত নতুন সং—এপ্রিল, ১৯৬৪, বৈশাখ, ১৩৭১; যিল্‌হাজ্‌, ১৩৮৩। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

উৎসর্গ—আল্লামা স্যার মুহম্মদ ইকবালের পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশে। পৃঃ [১২+ ৪]+৯২।

'শিক্‌ওআহ্‌ ও জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌ আল্লামা ইকবালের জনপ্রিয় জাতীয় খণ্ডকাব্য। আমি ইহা সাড়ে পাঁচ দিনে অনুবাদ করিয়াছিলাম। আমি মনে করি ইকবালের পবিত্র রূহ আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই খণ্ডকাব্যের কয়েকটি খ্যাত ও অখ্যাত অনুবাদ আজকাল প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আমার অনুবাদের প্রণালী সম্বন্ধে দু'য়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি, কারণ কেহই অনুবাদে মূলের ছন্দের অনুসরণ করেন নাই। আমি মনে করি, প্রথমতঃ অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলের ছবি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পদ্যানুবাদে মূলের কাঠাম বজায় রাখিতে হইবে; যথা—সনেটের অনুবাদে চতুর্দশপদী; গযলের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ও যতদূর সম্ভব অন্ত্য মিল (কাফিয়াহ) এবং যমক (রদীফ): এইরূপ রুবাইয়াতের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ৪, অন্ত্যমিল ও যতদূর সম্ভব যমক রক্ষা করিতে হইবে। শিক্‌ওআহ্‌ ও জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌ মুসদ্দস অর্থাৎ ছয় চরণবিশিষ্ট। ইহার প্রথম চারি চরণে এক মিল এবং শেষ দুই চরণে অন্য এক মিল। কখনও মিলের পরে যমক থাকে। সাধারণ উর্দু কবিতার ন্যায় ইহা আরবী ছন্দে রচিত।...

'বলা কর্তব্য, আমাদের কয়েকজন কবি বাংলা ভাষায় আরবী ছন্দের প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পরে তাহা ত্যাগ করেন। আমি চরণ-সংখ্যা, মিল ও যথাসাধ্য যমকে মূলের অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু বাংলা ভাষার

সেই স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি, যাহা মূলের ছন্দের অনুরূপ, কিন্তু এক নয়।

এই নূতন সংস্করণে আমি বাংলা অক্ষরে উর্দুর অনুলিখন করিয়াছি।"(নূতন সংস্করণের ভূমিকা : ১লা বৈশাখ, ১৩৭৯)।

সূচী—ভূমিকা। শিক্ওআহ্। জওআব-ই-শিক্ওআহ্। প্রথম স্তবক সূচী। ইকবাল পরিচিতি।

মূল এবং অনুবাদ পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে।

৩. **অমিয়বাণী শতক**। প্রথম প্রকাশ—১৩৪৮ (১৯৪১), ঢাকা। পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬২, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স। পৃঃ ৩৬। মূল সহ মহানবীর বাণীর অনুবাদ।

৪. **রুবাইয়াত-ই-উমর-খয়্যাম**। প্রথম প্রকাশ—১৯৪২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ৯৮।

সূচী—উমর খয়্যামের খাঁটি কবিতা। উমর খয়্যামের জীবনী ও চরিত্র। উমর খয়্যামের মতবাদ। মূল ছন্দে ১৫১টি রুবাইয়ের অনুবাদ।

৫. **মহাবাণী**। প্রথম প্রকাশ—[?] দ্বি-সং ১৯৪৬। বগুড়া। পৃঃ ৪০।

সূচী—সূরা ফাতেহার অনুবাদ ও বিস্তৃত ভাষ্য। আল্-ফীল, আল্-কোরায়শ, আল্-মাউন, আল্-কাওসর, আল্-কাফিরুন, আল্-নসর্, আল্-লহব, আল্-ইখলাস, আল্-ফলক্, আল্ নাস সূরার অনুবাদ ও ভাবার্থ।

৬. **বাইঅতনামা**। প্রথম প্রকাশ—১৯৪৮। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

কুর্আন ও হদীসের উপদেশাবলীর অনুবাদ।

৭. **বিদ্যাপতি-শতক**। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬১ ; সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। ২য় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৭৪ ; সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭।

উৎসর্গ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (১৯২১-২৪ খ্রীঃ অঃ) পিতামহপ্রতিম অশেষ শ্রদ্ধাভাজন সংস্কৃত ও বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক পুণ্যশ্লোক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণোদ্দেশে এই গ্রন্থ সমর্পিত হইল। পৃঃ [৮+২।৶০]+১০০।

'আমি শতাব্দীর এক চতুর্থাংশের অধিককাল বিদ্যাপতির অধ্যয়নে ও ও অধ্যাপনায় নিরত আছি।...আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস জনসাধারণ ও ছাত্র-সমাজের ব্যবহারের জন্য। আমি পদাবলীর ছন্দ অনুকরণ করিয়া পদ্যানুবাদ দিয়াছি। জানি না ইহাতে আমি "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং" কিনা। তবে ভরসা "মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ"। যতদূর সম্ভব আমি বিদ্যাপতির খাঁটি পদ ও পদের ভাষা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি।' (মুখবন্ধ : ২৩.৯.৫৪ ইং)।

ী—ভূমিকা : বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির শুদ্ধ পদ ও ভাষা; মৈথিলী ব্যাকরণ।

নায়িকার রূপবর্ণনা (১-৭) : কি আরে নব জৌবন অভিরামা (আঃ মরি নব যৌবন অভিরাম), চাঁদ সার লএ মুখ ঘটনা করু (লইয়া চাঁদের সার গড়িল মু'খানি), ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল (ভাল হ'ল দম্পতির শৈশব ঘুচিল), কামিনি করএ সনানে (করিতেছে কামিনী সিনান), আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি (আজি দেখিতেছি কালি দেখিয়াছ), রামা অধিক চঙ্গিম ভেল (রামা কী-রূপসী হ'ল), কুসুমবান বিলাস কানন (কুসুমধনুর বিলাস-কানন)।

নায়িকার পুর্বরাগ (৮-১৩) : বিকে গেলিহুঁ মাধুর মধুরিপু (গেনু হাটে মথুরায় সাজায়ে নানা পসার), অবনত আনন কএ হমে রহলিহুঁ (নত করিয়া আনন ছিনু আমি কতক্ষণ), কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা (কত না বেদনা মোরে দিস্ রে মদন), চিকুর নিকর তম সম (চিকুরনিকর তম সমতুল), দএ গেলি সুন্দরি দএ গেলী রে (দিয়ে গেল রূপবতী, দিয়ে গেল ওরে), সহজহি আনন সুন্দর বে (স্বভাব-সুন্দর তাহার আনন)।

নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি (১৪-১৮) : কণ্টক মাঝ কুসুম পরগাস (কণ্টকনিচয় মাঝে কুসুম প্রকাশ), এ সখি এ সখি ন বোলহ আন (ওলো সই, ওলো সই, ব'লো নাকো আন), লাখে তরুঅর কোটিহি লতা (লাখও তরুবর কোটি কোটি লতা), সে অতি নাগর তোঞে রস সার (রসিক নাগর সে যে, তুমি রসসার), আসাঞে মন্দির নিসি গমাবএ (মন্দিরে আশায় রজনী পোহায়)।

নায়কনায়িকার পরস্পর অনুরাগ (১৯) : জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি (যবে দুই দীঠি হ'ল ছাড়াছাড়ি)।

· নৌকাখণ্ড [নায়িকার উক্তি] (২০) : কুল গুন গৌরব সীল সোভাব (কুল-গৌরব স্বভাব গুণশীল হয়)।

কৌতুক (২১-২৩) : নিধন কা জঞো ধন কিছু হো (কাঙালের যদি ধন কিছু হয়), বদন কামিনী হে বেকত জনু করিহহ (কামিনী ! বদন ক'রো না বেকত), অম্বরে বদন ঝপাবহ গোরি (আঁচলে বদনখানি ঢাক গো সুন্দরী)।

অভিসার (২৪-২৭) : নূপুর রসনা পরিহর দেহ (নূপুর রসনা ধনী ! সব ছেড়ে দাও), মৃগমদ পঙ্ক অলকা (মৃগমদে লেপো না অলক), রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম (রজনী বমিছে তম, পথে ভীম ভুজঙ্গম), নিসি নিসিঅর ভম ভীম ভুজঙ্গম (নিশি নিশাচর ভ্রমে পথ রুদ্ধ ভুজঙ্গমে)।

নায়িকার মান (২৮-৪২): বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর (বদন শশাঙ্ক তোর নয়ন চকোর মোর), অরে অরে ভমরা তোঞে হিত হমরা (ওরে রে ভ্রমর! তুই সখা মোর), গগন মড়ল উগ কলানিধি (গগন মণ্ডলে উঠে কলানিধি), চাঁদ সুধাসম বচন বিলাস (চন্দ্রমার সুধা সম বচন-বিলাস), মধুসম বচন কুলিস সম মানস (মধু সদৃশ বচন বজ্র সমতুল মন), দহ দিস সুন সন অধিক পিআসল (দশ দিক শূন্যতুল অধিক পিপাসাকুল), অপনহি পেম তরুঅর বাঢ়ল (আপনা আপনি প্রেম তরুটি বাড়িল), সৌরভ লোভে ভমর ভমি আএল (সৌরভ লোভেতে অলি ঘুরিয়া ফিরিয়া এল), তোহর বচন অমিঅ ঐসন (তোমার বচন অমৃত যেমন), জনম হোঅএ জনি জঞো পুনু হোই (জনমের পরে যদি জন্ম কেউ নেয়), সিনেহ বঢ়াওব ই ছল ভাণ (বাড়াইবে প্রেম তার, ছিল এই মনে), গগন মড়ল দুহুক ভুখন (গগন মণ্ডলে দু'য়ের ভূষণ), জঞো ডিঠিকা ওল এহি মতি তোরি (হোক সে চোখের আড়, যদি তব মতি), জহিআ কাহ্নু দেল তোহি আনি (যখন দিলাম তোরে কানাই রে আনি), এতদিন ছল পিয়া তোহ হম জেহে হিআ (এতদিন ছিনু পিয়া তুমি আমি এক হিয়া)।

নায়কের মান (৪৩-৫৪): করঞো বিনতি জত জত মন লাই (মন দিয়া যত কেন করি না বিনয়), দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুষ নেহা (দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় সুপুরুষ নেহ), বারিস নিসা মঞে চলি অএলিহু (বরিষার বিভাবরী চলে এনু একেশ্বরী), দুরজন বচন ন লহ সব ঠাম (দুরজন বচন না লবে সব ঠাম), কী হমে সাঁঝক একসরি তারা (আমি কি সাঁঝের একেশ্বর তারা), জতি জতি ধমিঅ অনল (যতই দহিবে জ্বালায়ে অনল), দিবস মন্দ ভল ন রহএ সব থন (দিবস মন্দ বা ভাল নহে রহে চিরকাল), করতল কমল নয়ন ঢর নীর (করতলে কমল, নয়নে ঝরে নীর), সে ভল কে বরু বসএ বিদেসে (সেই ভাল বরং প্রিয় থাকুক বিদেশে), ধন জউবন রস রঙ্গে (ধন যউবন আর রস রঙ্গ), রসিকক সরবস নাগরি বানি (রসিকের সরবস্ব নাগরীর বাণী), মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে (মাধব, করিও সুমুখী-হৃদয়রঞ্জন)।

বসন্ত (৫৫-৫৭): লতা তরুঅর মণ্ডপ জীতি (এবে লতা তরুবর মণ্ডপ জিতিল), মলয় পবন বহ (মলয় পবন বহে), অভিনব পল্লব বইসক দেল (নবীন পল্লবে দিল পিঁড়া বসিবার)।

বিরহের আশঙ্কা (৫৮): সখি হে বালঁভ জিতব বিদেসে (সখী গো! প্রিয় মোর যাইবে বিদেশে)।

বিরহ (৫৯-৯৩): কালি কহল পিয়াঞে সাঁঝহি রে জাএব (কালি কহিল

প্রিয়, সাঁঝের বেলায় ওগো), দহএ বুলিএ বুলি ভমরি করুণা কর (দশ দিকে ঘুরে ঘুরে ভমরী করুণা করে), না জানল কোন দোসে গেলাহ বিদেস (নাহি জানি কোন্ দোষে গেল সে বিদেশ), মঞে ছলি পুরুব পেম ভরে ভোরী (ছিনু আমি পুরাতন প্রেমেতে বিভোর), পহিলি পিরীতি পরান আঁতর (প্রথম পিরীতি কালে সহিত না প্রাণান্তর), অবিরল পরএ মদন সবধারা (অবিরত পড়িতেছে কাম-শর-ধাব্), নউমি দসা দেখি গেলাহে নড়াএ (দেখিয়া নবমী দশা গেলেন চলিয়া), কুসুমে রচল সেজ মলয়জ পঙ্কজ (কৈল ফুল-শয্যা পিয়া চন্দন-পঙ্কজ দিয়া) কুন্দ কুসুম ভরি সেজ সোহাওন (কুন্দকুসুমে রচিত শয্যাখানি সুশোভিত), প্রথমহি উপজল নব অনুরাগে (প্রথমে মাতিলে যবে নব অনুরাগে), জলউ জলধি জল মন্দা (জলুক ক্ষীরোদ-সিন্ধু জল মন্দ), আনহ কেতকিকের পাত (আন গো কেতকী পাতা একখানি), সখি হে মোরে বোলে পুছব কহ্নাই (সখী হে, মোব হ'য়ে পুছিবে কানাই), করতল লীন সোভএ মুখচন্দ (রাঙা করতলে লগ্ন শোভে মুখচন্দ), লোচন ধাফ এধাএল (আঁখি বাবে বারে ধায় দেখিবারে), বরিসএ লাগল গরজি পয়োধর (বর্ষিতে লাগিল গর্জি পয়োধর), খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব (আমি কোকিল খেদাব, অলিকুল নিবাবিব), সাহর সউরত গগন ভরে (সহকার-সৌরভে গগন ভবে), কাননে কাননে কুন্দ ফুল (কাননে কাননে ফোটে কুন্দ ফুল), সরোবর মজ্জি সমীরণ বিথরও (ডুবি সরোবরে ছড়ায় পবন), বসন্ত রয়নি রঙ্গে পলটি খেপবি সঙ্গে (বসন্ত রজনী রঙ্গে আবার যাপিব সঙ্গে), মাধব কঠিন হৃদয় পববাসী (মাধব। পরবাসী কঠিন হৃদয়), অকামিক মন্দির ভেলি বহায় (অকস্মাৎ রাই এল ঘর হ'তে বার), গগন গরজ মেঘা উঠএ ধরনি খেঘা (মেঘ গরজে অম্বরে, উঠে ধনী মাটি ধ'রে), কর কিসলয় সয়ন রচিত (কর-কিশলয়ে কপোল রাখিয়া), একহিঁ বেরি অনুরাগ বঢ়াওল (শুধু তুমি একবার বাড়াইলে অনুবাগ), মলিন চিকুর তনু চীরে (মলিন চিকুব, তনু আর চীর), সুন সুন মাধব সুন মোরি বানী (শুন শুন হে মাধব! শুন মোর বাণী), নব কিসলয় সয়ন সুতলি (নব কিশলয় শয়নে শায়িতা), খনে সন্তাপ সতী জর জাড় (ক্ষণে কাঁপে শীতে, ক্ষণে জরে জলে দেহ), মাধব জানল ন জিউতি রাহী (মাধব! বুঝিলাম বাঁচিবে না রাই), কত কত ভমি পুরুস দেখল (কত দেশ ভ্রমি দেখিলাম কত), মোরি অবিনএ জত পরলি খেঞোব তত (মোর অবিনয় যত হইল ক্ষমিবে তত), করহিঁ মিলল রহ মুখ নহি সুন্দর (মুখ করতল লীন হয়েছে সুষমাহীন), আজে তিমির দহ দীস ছড়লা (আজি দশ দিক হতে তিমির ছাড়িল)।

ভাবোল্লাস (৯৪-৯৯) : মোরাহি রে অঁগনা চাঁদনকেরি গছিআ (আমার আঙিনা মাঝে চন্দনের গাছ রাজে), সুরভি সময় ভল চল মলআনিল (ভাল স্বরভি সময় বহিছে মৃদু মলয়), দারুন বসন্ত যত দুখ দেল (দারুণ বসন্ত মোরে যত দুঃখ দিল), অধর সুধা মিঠি দুধে ধবরি ডিঠি (অধর অমিয়-মিষ্টি দুগ্ধ সম শ্বেত দৃষ্টি), জা লাগি চাঁদন বিখ তহ তিখ ভেল (যার লাগিয়া চন্দন বিষ হ'তে তীক্ষ্ণ হ'ল), জনম কৃতারথ সুপুরুস সঙ্গ (কৃতার্থ জনম যার সুপুরুষ সঙ্গ)।

প্রার্থনা (১০০): খেত কএল রখবারে লুটল (করিলাম ক্ষেত লুটিল রাখাল)। অকারাদিক্রমে পদসূচী। অকারাদিক্রমে শব্দসূচী।

৮. **অমরকাব্য**। প্রথম প্রকাশ— জমাদিউল্ আওওল ১৩৮২ হিঃ; আশ্বিন ১৩৭০; অক্টোবর ১৯৬৩। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

উৎসর্গ—মুজাদ্দিদে যমান হযরত মৌলানা শাহ সূফী মুহম্মদ আবু বকর সিদ্দীকী (রাহঃ) সাহেবের নামে উৎসর্গীকৃত। পৃঃ [৮]+৬৪।

'আরবী কসীদঃ কাব্যের মধ্যে বানত সু'আদ এবং কসাদতুল বুর্দঃ কেবল বিখ্যাত নয়, পবিত্র ও পুণ্যজনক বলিয়া আঁ হযরতের (দঃ) ভক্তগণের নিত্যপাঠ্য ওযীফঃ। পদ্যে মূলের ভাবের ইতর বিশেষ অপরিহার্য। এজন্য আমি তাহাদের আক্ষরিক অনুবাদ গদ্যে করিয়াছি।' (আরয: ১লা জমাদিউল্ আওওল ১৩৮৩ হিঃ)।

শয়খ ইমাম আবু আব্দিল্লাহ্ মুহম্মদ শরফুদ্দিন বিন্ স'ঈদ বিন্ হসন বুসীরী (রহঃ)-র "কসীদতুল বুর্দঃ" এবং কা'ব বিন্ যুহয়র (রাঃ) রচিত "বানত-সু' আদ" আরবী কাব্যদ্বয়ের মূল থেকে গদ্যানুবাদ। "কসীদতুল্ বুর্দঃ" গদ্যানুবাদ আল ইসলাম ১৩২৬, বৈশাখ সংখ্যায় এবং "বানত-সু'আদ" বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় ১৩২৭, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত। "শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা-গ্রন্থে"ও এই দুটি অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি অনুবাদের পূর্বে তিনি কবি-জীবনী দিয়েছেন॥

৯. **Hundred Sayings of the Holy Prophet.** First Published—1945. Second Edition—1949. Renaissance Printers, Dacca.

Translations with Arabic text of 100 sayings of Prophet from Mashariqul Anwar.

১০. **Buddhist Mystic Songs.** Oldest Bengali and other eastern vernaculars. First Published— 1960. Bengali Literary Society, Department of Bengali, University of Karachi. Revised and enlarged edition 1966. Bengali Academy, Dacca.

Dedicated to the memory of Abu Raihan-al-Biruni, the earliest

Muslim Indologist and to the memory of my revered professors of the Sorbonne, France during my studentship there in 1926 to 1928. P [X+XXXVI]+142

Foreword by Syed Ali Ahsan, Director, Bengali Academy, Dacca.

'Dr. Shahidullah is an internationally reputed Philologist and an authority on Old Bengali. As a close associate of Prof. Sastri he worked in the University of Dacca and taught Bauddha Gan, afterwards in Paris University he further worked on these songs for his thesis Les chants Mystiques, which was highly appreciated by the scholars on the subject. He has translated and given annotations to the texts. His preface to the present edition is a piece of scholarly treatise on the subject.' (Foreword)

Contents : Preface : The authors, The Grammar of the Mystic songs, The Language of the songs, The Metre, Social picture in the songs, The cult, The value of the Buddhist Songs.

Text 1. Lui 2. Kukkuri 3. Viruba 4. Gundari 5. Catilla 6. Bhusuku 7. Kahna (Krsna) 8. Kambalambara 9. Kahna (Krsna) 10. -do- 11. -do- 12. -do- 13. -do- 14. Dombi, 15. Santi 16 Mahidhara 17. Vinapada 18. Kahna (Krsna) 19. -do- 20. Kukkuri 21. Bhusuku 22. Saraha 23. Bhusuku (24 & 25 : Two texts are missing, Carya XXIV by Kanha and Carya XXV by Tantripada are missing in the text) 26. Sabara 27. Bhusuku 28. Sabara 29. Lui 30. Bhusuku 31. Aryadeva 32. Saraha 33. Dhendhana 34. Darika 35. Bhade 36. Kahna (Krsna) 37. Tadaka 38. Saraha 39. -do- 40. Kahna (Krsna) 41. Bhusuku 42. Kahna (Krsna) 43. Bhusuku 44. Kankana 45. Kahna (Krsna) 46. Jayanandi 47. Dharma (Text No. 48 by Kukkuripa is missing) 49. Bhusuku 50. Sabara. Authors' Index. Bibliography.

১১. **কুর্‌আন শরীফ**। কুর্‌আনের অনুবাদ ও বিস্তৃত ভাষ্য প্রকাশের প্রতীক্ষায়।

১২. **বুখারী শরীফ**। হাদীস গ্রন্থ 'বুখারী শরীফের' প্রথম খণ্ডের অনুবাদ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিতব্য।

ঘ. ছোটি গল্প

রকমারি। প্রথম প্রকাশ— ১৯৩২। ৩য় সং ১৯৫০। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, 'এর প্রায় সব গল্পই আগে নানান্ কাগজে বেরিয়ে গিয়েছে। আজ এক জায়গায়

করে সকলের সামনে ধরলুম। যদি কারও ভাল লাগে আমার কলম ধন্য হবে।'
(মুখবন্ধ। ১১. ১০. ৩১)

সূচী— লা পরিষিয়েন। বিলাত ফেরত। বেহেশ্‌তের পত্র। লক্‌খীছাড়া। বিশ্বাসের মূল্য। রসবতী। ভবিষ্যতের মানুষ। গোরুচোর। নষ্টচন্দ্র। লজ্জাবতী। অন্ধ কনে। বহুরূপী। গেরস্থের বৌ।

ঙ. শিশুসাহিত্য ঃ

১. **ছোটদের ইসলাম শিক্ষা**। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ৪৪।

২. **ছোটদের দীনিয়াত শিক্ষা**। আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা।

৩. **চরিতকথা**। ১ম ভাগ। ২য় সং ১৯৫২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ৮৭।

৪. **চরিতকথা**। ২য় ভাগ। ২য় সংস্করণ ১৯৫২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ৯৯।

৫. **জ্ঞানের কথা**। ২য় সংস্করণ ১৯৫২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ১০৩।

৬. **ছোটদের নবী কথা**। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯। ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬১। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ৯০।

৭. **কথামঞ্জরী**। নবম সংস্করণ ১৯৬১। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ৮৫।

৮. **নীতিকথা**। দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৬১। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ৬৪।

৯. **সিন্দবাদ সওদাগর**। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।

১০. **ছোটদের রসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)**। প্রথম প্রকাশ রবীউল্‌ আওওল ১৩৮২ হিঃ ; শ্রাবণ ১৩৬৯ ; আগস্ট ১৯৬২। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। পৃঃ [৬]+৮০।

'রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। কেবল দরূদ শরীফ পড়িলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহার আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তোলা চাই। বাল্যকালে মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তাহা স্থায়ী হয়। এই জন্য এই "ছোটদের রসূলুল্লাহ" (দঃ) প্রকাশিত হইল। রবীউল্‌ আওওল মাসে ইহার প্রকাশ অর্থপূর্ণ। এই মাস রসূলের মাস, যেহেতু এই মাসে তাঁহার জন্ম, নবুওত প্রাপ্তি, হিজরত ও ওফাত। যাহাদের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল, আমার সেই পোতা-পুতনী, নাতি-নাতনীস্থানীয় সকলে ইহা পড়িয়া আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিলে আমার

শ্রম সফল হইবে, আমি ধন্য হইব। তাহাদের জন্য আমার প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য দোআ রহিল আর তাহাদের হাতেই দিলাম এই অমূল্য জীবনী। ইতি ৩রা রবীউল আওওল, ১৩৮২ হিজরী ; মোতাবেক ২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ সন ; ৫ই আগস্ট, ১৯৬২ ইং।' (মুখবন্ধ)

সূচী— ফাতিহাহ্ দুয়াষ্ দহম। হযরত মুহম্মদ (দঃ)। হযরতের মদীনায় প্রস্থান। হযরতের অন্তিম কাল। হযরত ও ক্ষমা। হযরত ও দয়া। হযরতের বলা একটি গল্প। ছোটদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ (দঃ)। হদীস আলাপন। হযরতের চার আসহাব। 'আশরাহ্ মুবাশ্ শরাহ্। হযরতের বীর সেনানী খালীদ।

১১. **সেকালের রূপকথা**। দেশীয় রূপকথা ও উপকথার সংকলন। প্রকাশের পথে।

চ. সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ

১. **পদ্মাবতী**। ১ম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ—১৯৫০। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ [৪০]+২৮৬।

'আমি মূল হিন্দীর সাহায্যে বাংলা বাজার-সংস্করণ সংশোধিত করিয়া আমার সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ইহা আলাওলের মূল পাঠের যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী।' (ভূমিকা)

'পদ্মাবতী'র পাঠ সংশোধন করে অর্ধেকটা প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেছেন কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত খণ্ডে গ্রন্থপাঠ-আলোচনা, আলাওলের জীবনী, মালিক মুহম্মদ জয়সীর জীবনী, পদ্মাবতী উপাখ্যান, আলাওলের পদ্মাবতীর উপাখ্যান এবং পদ্মাবতী উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন।

২. **গল্পসঞ্চয়ন**। প্রথম প্রকাশ—১৯৫৩। প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃঃ ২৩৬।

সৈয়দ আলী আহসানের সহযোগে সম্পাদিত ১৬টি ছোট গল্পের সংকলন, ছোট গল্পের ধারা-সম্বলিত ভূমিকাসহ।

৩. **পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান**। প্রথম অংশ ঃ অ—আন্দুর। ১৯৬৪। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। প্রধান সম্পাদক। বাকী খণ্ডগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

৪. **ইসলামী বিশ্বকোষ**। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। প্রধান সম্পাদক। প্রকাশের পথে।

৫. **উর্দু অভিধান**। উর্দু উন্নয়ন-সংস্থা, করাচী। সম্পাদক। প্রকাশের পথে।

ছ. সম্পাদিত পত্রিকা ঃ

১. **আল্-এস্লাম**। মাসিক। কলিকাতা। ১৩২২ বৈশাখ—১৩২৬ চৈত্র। সহকারী সম্পাদক।

২. **বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা**। ত্রৈমাসিক। কলিকাতা। ১৩২৫ বৈশাখ—১৩২৭ চৈত্র। মোজাম্মেল হক সহযোগে সম্পাদনা।

৩. **আঙ্গুর**। শিশু মাসিক। কলিকাতা। ১৩২৭ বৈশাখ—১৩২৭ চৈত্র। সম্পাদক।

৪. **The Peace.** Monthly, Dacca, 1922 August—1930 June. Editor.

৫. **বঙ্গভুমি**। মাসিক। ঢাকা। ১৩৪৪ আষাঢ়—১৩৪৪ কার্তিক। নামে পরিচালক আসলে সম্পাদক।

৬. **তক্‌বির**। পাক্ষিক। বগুড়া। ১৩৫৪, ২৩শে আশ্বিন—১৩৫৪, ৪ঠা আষাঢ়। সম্পাদক।

জ. শহীদুল্লাহ্-লিখিত ভুমিকা ঃ

১. **কোরাণ-কণিকা**। মৌলবী মীর ফজলে আলী। ১৯৩১।

২. **মণিদীপ**। এস. এন. কিউ. জুল্‌ফিকার আলী।

৩. **শূন্যপুরাণ**। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৩৬।

৪. **লোকসাহিত্য**। আশরাফ্ সিদ্দীকী। ১৯৬৩।

৫. **Ethics of Islam.** Syed Amir Ali, 1951.

৬. **ফরহংগে রব্বাণী উর্দু-বাংলা অভিধান**। ১৯৫৮।

ঝ. শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থ ঃ

১. **মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ**। আবুয্‌যোহা নূর আহমদ। ১৩৪৬।

২. **মৃগনাভি**। আলাউদ্দিন আল্ আজাদ। ফেব্রুয়ারী, ১৩৫৪।

৩. **পদক্ষেপ**। আবদুল আজীজ আল আমান। কার্তিক, ১৩৬৫।

৪. **চক্‌মকি**। গোলাম রহমান। ১৯৬১।

৫. **কবি হেয়াত মামুদ**। ডঃ মুযহারুল ইসলাম। আগস্ট ১৯৬১।

৬. **ভাষা ও সাহিত্য-সপ্তাহ**—১৩৭০। মুহম্মদ আবদুল হাইর সম্পাদিত। বৈশাখ ১৩৭১।

৭. **ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব**। মুহম্মদ আবদুল হাই। নভেম্বর, ১৯৬৪। (জন রুপার্ট ফার্থকেও)।

৮. **মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য**। ডঃ আনিসুজ্জামান। আশ্বিন, ১৩৭১।

৯. **পূবালী ফসল** (কিশোর বার্ষিকী)। মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্দীন সম্পাদিত। আগস্ট, ১৯৬৪।

১০. **আধুনিক উপকথা**। মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্‌। আষাঢ়, ১৩৭৩।

১১. **নীল দিগন্তের ওপারে**। মীর মশাররফ হোসেন। ১৯৬৬।

এও. শহীদুল্লাহ্‌-সম্পর্কিত গ্রন্থ ঃ

১. **Muhammad Sahidullah Felicitation Volume** । Edited by Muhammad Enamul Haq । First Published—July 10, 1966 । Asiatic Society of Pakistan, Museum Building, Ramna, Dacca-2. Asiatic Society of Pakistan Publication No. 17 / P XXXVI + 422.

This special volume of dissertations is published from the Asiatic Society of Pakistan, Dacca, to felicitate Dr. Muhammad Shahidullah, M. A. B. L. (Cal.), D. Litt. (Paris), Dipl. Phon. (Paris), Vidya-vachaspati (Dacca), a founder-member and an eminent Ex-President of the Society, on completion of the eightieth year of his life on the 10th July 1965. Perhaps, no other occasion would have been more suitable for this purpose.

Dr. Muhammad Shahidullah is well known in the Indo-Pakistan subcontinent, nay, much beyond its limit, as an eminent oriental scholar, whose intellectual activities spreading over three successive generations of our people, have been a constant source of inspiration to us. In fact, we regard him as a living symbol of scholarship and research. By honouring him, the Asiatic Society of Pakistan, Dacca desires to honour scholarship in general and oriental lore in particular...

As the present volume is a special one, we approached scholars, particularly orientalists, at home and abroad, for their contributions to this volume. The response, we received, was worthy of expectation. Those who have co-operated with us in this venture are men of great eminence, and some of them are scholars of international reputation. At a considerable sacrifice of their precious time and personal comfort, they had to write for this

volume. We cannot forget the favour they have shown us and we thank them most sincerely for their active co-operation and valuable contributions...

This volume was to be presented to Dr. Muhammad Shahidullah about a year ago. But unfortunately, full advantage of the special occasion chosen for the purpose could not be taken in time, due to causes beyond the control of the editor...

Dr. Muhammad Shahidullah has just (July, 1966) completed the 81st year of his life. Thank God, he is still hale and hearty and has been rendering active intellectual services to the Nation. May Allah grant him a long, active and happy life to serve the Nation for years to come. Amen !! (Editor's Note : 10. 7. 66).

Contents : Editor's Note – Dr. Muhammad Enamul Haq. Significance of the Legends on Muslim Coins—Mr. Shamsuddin Ahmad. Education and Culture in Dacca during the last one hundred years—Mr. S. M. Ali. Some less known Dialects of "Kohistan"—Dr. N. A. Baloch. The Doctrine of Impermanence —Mr. P. R. Barua. Comparative study of the Bhikkhu and Bhikkhuni Vibhangas—Mr. Rabindra Bijay Barua. A Review of the Lexicography in Bengali (1743-1867 A. D.) – Mr. Jatindra Mohan Bhattacharjee Verb-Morphology of Old Persian (A study of syntax) – Mr. Sukumar Biswas. The Eighteenth Century in India – Dr. Suniti Kumar Chatterji. Mahabat Khan in Historical Plays—Mr. Munier Chowdhury. Date of Kanishka (Palæographical Evidence)—Dr. Ahmad Hasan Dani. Sarasvati and Burma -- Mr. Devaprasad Guha. The Najat al Rashid of 'Abd al-Qadir Badayuni—Dr. A. B. M. Habibullah. Siddiq Hasan Khan Bahadur (1248-1308 A. H 1832-1890 A. D), Nawab-consort of Bhopal – Mr. John A. Haywood. The Risalat al-Quds of Ibn al-Arabi Dr. S M. Imamuddin. The Cultural Impact of Communism—Dr. S. R. Kamm. The Kannada word for 'Sparrow'—Dr. S. M. Katre. A secret letter from the Ameer of Bukhara to the Government of India (1870—1871)—Dr. M. Anwar Khan. The four cosmic Elements in Historical perspective—Dr. S. Mahdihassan. Bengali Prose Writing before 1800 — Dr. Ramesh Chandra Majumdar. The Tradition of Literary Languages in Indo-Pak Subcontinent—Dr. Qazi Abdul Mannan

Shaikh 'Ali al-Muttaqi's Risalah Fi al-Tahdhir—Dr. M. Saghir Hasan Ma'sumi. Umar Khayyam on Concept of the Beautiful—Dr. Harendra Chandra Paul. Alivardi Khan—Dr. M. Abdur Rahim. The Foundation of the Karrani Rule in Bengal—Mr. A. K. Md. Fazlur Rahaman. Some Hindu Romantic Poets—Mr. Ahmed Sharif. Notes on an Unknown Portrait of Tana Shah (Last Ruler of Golkonda)—Dr. Vito Salierno. Notes on two Indo-Muslim Architectural Monuments—Dr. Momtazur Rahaman Tarafdar. A Social Psychological Study of Fatalism in Two Villages in East Pakistan—Dr. S. M. Hafeez Zaidi.

২. **সাহিত্য-পত্রিকা**—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা-সংখ্যা। বর্ষা ১৩৭২। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. **সাহিত্যিকা**—শহীদুল্লাহ্ সংখ্যা। শরৎ ১৩৭২। বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. **শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা-গ্রন্থ**—মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্ সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৩৭৩; মার্চ ১৯৬৭। রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা। পৃ: [২৬]+৪২+৬২০+৩২৬+৭৬+[২]=১০৯২ পৃ:।

'এই পুস্তক-সম্পাদনা আমার জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই দশের লাঠি একের বোঝা বলে মনে হয়নি আমার কাছে। প্রকাশকের ভূমিকায় পুরোপুরি নামার ইচ্ছে নিয়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ১৯৬২ থেকে আমি সর্বক্ষণ এই সংবর্ধনা-গ্রন্থ ও ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে লাগার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকি। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪-র অক্টোবরে চাকরীর সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে আমি ১৯৬৫-র জুলাই মাসে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র জন্মদিনে এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য তৈরী হ'তে থাকি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে তারিখও পেরিয়ে গেছে।...

আল্লাহ্‌র করুণা অশেষ। সুদীর্ঘ আট বছর পর শেষ পর্যন্ত এই গুরু দায়িত্ব পালনে তিনি আমাকে কামিয়াব করেছেন। তাঁকে অনেক শুকরিয়া জানাই।' (সম্পাদকের কথা: ১০ জুলাই ১৯৬৬)।

সূচী—উৎসর্গ পত্র (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত)। মুখবন্ধ (সৈয়দ আলী আহসান)। সম্পাদকের কথা। মহামনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—মুহম্মদ এনামুল হক।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নির্বাচিত রচনাবলী :

অভিভাষণ—নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন। চাঁদপুর মুসলিম যুবক সমিতি। পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন। ত্রিপুরা জেলা শিক্ষক-সমিতি। পূর্ব-ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলন। সিলট-সাংস্কৃতিক সম্মেলন।

ধর্ম ও সংস্কৃতি—কুর্‌আন শরীফের দুঃখ-তত্ত্ব। কুর্‌আন শরীফের মহিমা। ইসলাম ও বিশ্বসেবা। ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার। ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা। মদনভস্ম। শ্রীমদভগবদ্‌গীতার একটি পাঠান্তর। ভরত, কণ্ব ও বিশ্বামিত্র। হৈহয় কুলের শার্যাত শাখা। প্রাচীন ভারতে গো-বধ। আর্য জাতির প্রাচীনতম প্রেমকাহিনী। শাহ্‌নামা, আবেস্তা ও বেদ। কবির সাহেব ও হিন্দুধর্ম।

ভাষাতত্ত্ব ও লিপি—গল্পের জন্মান্তর। গল্পের রূপান্তর। ভাষা ও সমাজ। ভাষার উৎপত্তি। প্রাকৃত ও বাঙ্গালা। হিন্দু আর্য মূল ভাষা বা আদিম প্রাকৃত। পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য। বাঙ্গালা ভাষায় পারসী প্রভাব। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে উর্দু-হিন্দী প্রভাব। বাঙ্গালা ও উর্দু। বাংলা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার। বাংলা লিপি ও বানান-সংস্কার। বাংলা বর্ণমালার সংস্কার। সংস্কৃত ও পারসী। আমাদের কওমী যবান আরবী। আরবী বর্ণমালা।

বাংলা সাহিত্য—প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা। কানুপার কাল নির্ণয়। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি। মধ্যযুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা। বড়ু চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস সমস্যা। শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর। গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা। মহাকবি আলাওল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের নারী। পুঁথি-সাহিত্যের উৎপত্তি। সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের রাজা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ভক্ত নজরুল।

নির্বাচিত বিবিধ রচনাবলী :

গদ্য—ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ। বাঙ্গালা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব। সত্যিকারের আযাদী। সমাজসংস্কারক। কসীদতুল বুর্দঃ। বানত-সু'আদ। হয্‌রত য়ুনুস। মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী। দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে। দেশের কথা। আমার সাহিত্যিক জীবন। প্যারীর পত্র।

রূপরেখা, গল্প ও নাটক—পিঠে গাছের কাহিনী। হিংসুকের পরিণাম। বিশ্বাসের মূল্য। মাছের দাম। ভবিষ্যতের মানুষ। লক্‌খীছাড়া। গেরস্থের বৌ।

কবিতা—প্রার্থনা। নির্ভর। উন্নতি। বিনয়। অধ্যবসায়। ভাল ছেলে। কবি

ও ভ্রান্ত মানব। লায়লীর প্রতি মজনুঁ। শহরজাদী। জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি। রমযানের চাঁদ। হজ্জযাত্রী। না'ত। জাতীয় সঙ্গীত। সুপ্রভাত (২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে)। পাকিস্তান দিবস। নব্যচীন। সত্যেন্দ্র-স্মরণে। নূতন পুরুষ সূক্ত।

সংবর্ধনা লেখনাবলী ঃ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (স্মৃতিকথা)—তফাজ্জল হোসেন। রূপকথার মানুষ—মুহম্মদ আবুতালিব। স্মৃতির একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়—আফসার উদ্দিন শেখ। জীবনের জয়যাত্রা—মোহাম্মদ নাসির আলী। জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রসঙ্গে—আবুয্ যোহা নূর আহমদ। পুরাতনী—নন্দলাল দাস। অজাতশত্রু অধ্যাপক—গোবিন্দচন্দ্র দেব। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। আণ্ডুর প্রসঙ্গে—কাজী আফসার উদ্দীন। বাঙলার মুসলিম শিশু-সাহিত্যের জনক—খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন। ছন্দোদর্শী শহীদুল্লাহ্—আবদুল কাদির। সাত-পুরুষের শিক্ষক—রশীদ হায়দর। সম্পাদক শহীদুল্লাহ্—আলী আহমদ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুসরণে—সৈয়দ আলী আহসান। অন্য দৃষ্টিতে—আবদুল গণি হাজারী। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র গল্প—গোলাম রহমান। ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—মুহম্মদ আবদুল হাই। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে যেমন দেখেছি—কাজী মোতাহার হোসেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—একটি স্মরণীয় নাম—আজহারুল ইসলাম। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্—এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ও আমরা—হুমায়ুন খান। দরদী শহীদুল্লাহ্—মুহম্মদ মোতাদাইয়েন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রসঙ্গে—আবুল ফজল। পণ্ডিতপ্রবর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—খোদেজা খাতুন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—মযহারুল ইসলাম। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ঐতিহ্য সাধনা—খোন্দকার সিরাজুল হক। ঘরোয়া—মাহযুযা হক। দাদু, আমি ও আমরা—গীতিআরা সফিয়া। সালাম—মঈনুদ্দীন। তসলিম—জসিমউদ্দীন। প্রজ্ঞার নগাধিরাজ—সুফিয়া কামাল। তসলীম—হোসনে আরা। জ্ঞানের আকাশ—সৈয়দ আলী আহসান। মহাসাগর—জাহাঙ্গীর চৌধুরী। শ্রদ্ধার্ঘ্য—কালিশঙ্কর সাহিত্যরত্ন। তোমার স্মৃতি—জগদীশচন্দ্র রায়। সালাম—মসরুরা খাতুন।

পরিশিষ্ট ঃ

সঙ্কলিত মানপত্র—মুসলিম সাহিত্য সমাজের অভিনন্দন। পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের অভিনন্দন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতির শ্রদ্ধাঞ্জলি। পাকিস্তান

সাহিত্য-সংসদের সম্বর্ধনা। চিরকৃতজ্ঞ দেশবাসীর শ্রদ্ধাভিনন্দন। গুণমুগ্ধজনের মানপত্র। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর মানপত্র।

চিঠিপত্র—নজরুল ইসলামের চিঠি। দীনেশচন্দ্র সেনের পত্রাবলী। কতিপয় গুণমুগ্ধের পত্রাবলী—প্রমথনাথ বিশী—ভূপতিনাথ সেন—সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর—কালিদাস রায়—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র রচনাপঞ্জী—প্রকাশিত মুদ্রিত বাংলা প্রবন্ধ—স্কুলপাঠ্য পুস্তক—সম্পাদিত পত্রিকা—ভূমিকা—অভিভাষণ—উর্দু প্রবন্ধ-ইংরাজী প্রবন্ধাবলী। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনপঞ্জী। লেখক পরিচিতি।

৫. **Shahidulla Presentation Volume**। Edited by Dr. Anwar S. Dil। First published - May 1967। Linguistic Research Group of Pakistan, Lahore, West Punjab।

সংশোধন ও সংযোজন

সংশোধন ॥

৩৭ পৃঃ শেষ ছত্র। Archive de la Parole হবে।

৩৯ পৃঃ ১১ ছত্র। "পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজ" সংস্থায় মুসলিম হলের কতিপয় ছাত্রই শুধু ছিলেন না, এব উদ্যোক্তা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষকসম্প্রদায়ও এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন।

৫৬ পৃঃ শেষ দু' ছত্র। এমন ভাবে ছাপা হয়েছে যেন সেটি উদ্ধৃতির অংশ বলে মনে হবে। কিন্তু ও দু'টি ছত্র আমার লেখা।

৫৮ পৃঃ ১ ছত্র। ছেলেমেয়েদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এ দেশেই করেছেন কথাটা আংশিকভাবে সত্য। শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবেব পাঁচ ছেলের বিয়ে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে—তার মধ্যে চার জনের পশ্চিমবঙ্গের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আর সফিয়্যুল্লাহ্‌ সাহেবের বর্ধমানের কেতুগ্রামে। দুই ছেলে ও দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে পূর্ববঙ্গে।

৬১ পৃঃ ২ ছত্র। সফিয়্যুল্লাহ্‌ ছাত্রজীবনে ইত্যাদি। "আমার 'সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট পাণ্ডা' পরিচয় ভুল সংবাদ ভিত্তি করেই দিয়েছেন। আমি তাঁদের অবশ্য বন্ধু এবং সহকর্মী ছিলাম ব'লে অমন ভুল অনেকেই করেছে। আমি ছাত্র ফেডারেশনেরও একজন কর্মী ছিলাম। ঢাকা জেলা কংগ্রেসের

সেক্রেটারীও ছিলাম। পারলে আপনার মুখবন্ধে এ ভুলটুকু শুধরে দেবেন।" (লেখকের নিকট সফিয়্যুল্লাহ্ সাহেবের পত্র)

৮৮ পৃঃ ২৬ ছত্র। ত্রয়োদশ সংস্করণ (১৩৬১) স্থলে হবে (১৩৭৩)।

সংযোজন ॥

৩৮ পৃঃ ২১ ছত্রের পর। বিদেশেও তিনি আচারনিষ্ঠ জীবন যাপন করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "আমি ১৯২৮ সনে ইউরোপে যাই—আমি তাঁহাকেই চিঠি লিখি এবং তিনি যে হোটেলে ছিলেন সেই হোটেলেই আমার জন্য একটি ঘর ঠিক করিয়াছিলেন। সেই সুদূর বিদেশেও তিনি নিষ্ঠার সহিত স্বীয় ধর্মমত পালন করিয়া চলিতেন। তাঁহার একটি 'বদনা' ছিল এবং জবাই না করা হইলে সে মাংস তিনি খাইতেন না। প্যারিসে অনেক ছাত্রের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তাহারা আমাকে বলিত 'শহীদুল্লাহ্‌কে দেখিলেই Hindu (ফরাসীদের মতে ভারতীয়-মাত্রেই হিন্দু) বলিয়া চেনা যায় কিন্তু তোমাকে হিন্দু বলিয়া মনে হয় না।' ইহা লইয়া খুব হাসাহাসি করিতাম।" (লেখককে প্রদত্ত ডঃ মজুমদারের স্মৃতি-স্মরণ)।

৫০ পৃঃ ৫ ছত্রের পর পৃথক অনুচ্ছেদে। লাহোরের Linguistic Research Group of Pakistan-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের লেখা নিয়ে 'Sahidullah Presentation Volume' নামে একটি সংবর্ধনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা ২৯ই মে, ১৯৬৭ তারিখে একটি উৎসবের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মুহম্মদ ওসমান গণি সাহেবের হাত দিয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে দেওয়া হয়। এই সংবর্ধনা-গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন ডঃ আনওয়ার এস্. দীল। ঐ বছরের ১৪ই জুলাই ফরাসী জাতীয় দিবসে ঢাকাস্থ ফরাসী কনসাল তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি মুর্শেদের সভাপতিত্বে এক সভায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে ফরাসী পদকসহ Chevalier en order des arts et des letters' খেতাবে ভূষিত করেন।

৮৬ পৃঃ ২০ ছত্রের পর। সুনীতিকুমারের সঙ্গে তাঁর আরও একটি বিষয়ে গুরুতর মতভেদ হয়েছিল। তাঁর মতে বিজয় সিংহ প্রথম বাঙালী যিনি সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন আর সুনীতিবাবুর মতে বিজয় সিংহ গুজরাতী। ডঃ গাইগারের (Welhelm Geiger) মতও ছিল যে সিংহলে গুজরাতীরাই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু শহীদুল্লাহ্ সাহেব উপরোক্ত দুজনের অভিমত উপকথা ও ভাষা বিচার করে খণ্ডন করেছেন। তিনি 'The first

Aryan colonization of Ceylon' প্রবন্ধে বলেছেন "By an examination of the Sinhalese language in its historical development, we shall presently see that Sinhalese shows unmistakable affinity with the oldest phase of Bengali. This, of course, does not mean that the people from Gujrat never settled in Ceylon. What I mean is that the first Aryan settlers were from Bengal who introduced their language in the island." (The Indian Historical Quarterly Vol. IX. No. 3, September 1933)। সিংহলের পণ্ডিতসমাজ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতকেই সমর্থন করেছেন এবং তাঁদের ইতিহাস সেইভাবেই রচনা করেছেন। সিংহলীরা বাঙালীর বংশধর বলে পরিচয় দিতে ভালবাসেন, সেজন্যে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের উপরোক্ত প্রবন্ধ তাঁদের এত ভাল লেগেছে যে 'শ্রীলঙ্কা সাহিত্য-মণ্ডল' সিংহলী ভাষায় এটি অনুবাদ করে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব পরে সিংহলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধ 'Origin of the Sinhalese Language' রচনা করেন। প্রবন্ধটি Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society'-র Vol. VIII. part 1. 1962 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটিও সিংহলী পণ্ডিতসমাজে সমাদর লাভ করে।

১৪৯ পৃঃ ২ ছত্রের পর। বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পরিবর্তিত সং ১৩৭৩।

'আমার এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষাশিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীর জন্য রচিত। এইজন্য যেমন ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে।...এই গ্রন্থে কতক এমন বিষয় আছে, যাহা আমার বহুবর্ষ ব্যাপী মৌলিক গবেষণার ফল। আমাকে নূতন পরিভাষাও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।...

আজকাল নানা সাহিত্যপুস্তকে বিশেষতঃ নাটকে ও উপন্যাসে কথ্যভাষার বহুল প্রয়োগ হইতেছে। সেজন্য আমি প্রয়োজনমত স্থানে স্থানেই কথ্য ভাষারও রূপ দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে এই ব্যাকরণখানিকে প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে কিছু বিশেষ বলিয়া বোধ হইবে। নাতিদীর্ঘ পরিসরের মধ্যে একটি প্রয়োজনোচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা আমার চিরপোষিত কামনা ছিল। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি সুধীগণ বিচার করিবেন।'
(প্রথম সংস্করণের ভূমিকা: ১৭ই ফাল্গুন ১৩৪২ সাল)

সূচী : উপক্রমণিকা—বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড : বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ। **ধ্বনিপ্রকরণ :** শব্দ ; বাক্য, পদ, বর্ণ, অক্ষর : বর্ণমালা, স্বর-ব্যঞ্জন ; হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর ; মূল স্বর, গুণস্বর ; বৃদ্ধিস্বর ; বর্ণের উচ্চস্বর ; দ্বিত্ব ; বিদেশী শব্দের উচ্চারণ ; সন্ধি : স্বরসন্ধি ; ব্যঞ্জনসন্ধি ; স্বর-সঙ্কোচ ; স্বর-সাম্য ; ণত্ববিধান ; ষত্ববিধান। **শব্দ-প্রকরণ :** শব্দমালা (vocabulary) ; বিদেশী শব্দ ; পদ , বিশেষ্য ; বিশেষণ ; ক্রিয়া-বিশেষণ ও তাহার প্রয়োগ ; সংখ্যা , লিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রী-প্রত্যয় ; বচন ; কারণ ও পদ ; কর্তৃ-কারক ; কর্ম-কারক , করণ-কারক ; সম্প্রদান কারক ; অপাদান কারক ; সম্বন্ধ পদ ; অধিকরণ কারক ; সম্বোধন পদ ; শব্দরূপ ; সর্বনাম ; বিশেষণের তারতম্য , সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া ; যৌগিক ক্রিয়া ; পুরুষ ; কাল (ক্রিয়ার বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল) ; ক্রিয়ার ভাব (Mood) , ক্রিয়ার প্রয়োগ ; ধাতুরূপ, ধাতুর গণ ; অনুজ্ঞা বা আদেশ ভাবের প্রয়োগ ; অনিদেশক ভাবের প্রয়োগ ; নিষেধার্থক ক্রিয়া ; অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ ; প্রযোজক ক্রিয়া ; প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুরূপ ; সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া ; বাচ্য-পরিবর্তন ; উপসর্গ ও তাহার প্রয়োগ ; অব্যয় ; নিত্যসম্বন্ধ শব্দ ; বিভিন্ন পদরূপে একই শব্দের ব্যবহার ; পদপরিচয় ; সমাস ও তাহার প্রয়োগ ; দ্বন্দ্ব , তৎপুরুষ ; কর্মধারয়, উপমিত সমাস, উপমান সমাস, রূপক সমাস, দ্বিগু ; বহুব্রীহি , অব্যয়ী-ভাব ; নিত্য সমাস, উপপদ সমাস ; অলুক সমাস, মধ্যপদলোপী সমাস ; শব্দ-দ্বৈত ; ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত ; কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয় ; বাঙ্গালা কৃৎ-প্রত্যয় ; সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ; প্রত্যয়ান্ত ধাতু, প্রযোজক ; সনন্ত, যঙন্ত. যঙলুগন্ত ; নাম ধাতু ; বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় , সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ; ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও বিশেষ্য : শব্দগঠন। **বাক্যপ্রকরণ :** বাক্য , সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য ; সরল বাক্যের বিশ্লেষণ ; জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ ; যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ , বাক্যের প্রকার পরিবর্তন ; পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উক্তি ; পদক্রম (syntax) ; পদদ্বৈত ; শব্দ এবং বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ।

দ্বিতীয় খণ্ড। ছন্দ প্রকরণ ঃ অক্ষরবৃত্ত, বর্ণবৃত্ত , স্বরবৃত্ত ; মিল, স্বরাঘাত ; স্তবক, অনুপ্রাস ; পয়ার ; কুসুমবালিকা, মুক্ত পয়ার ; চতুর্দশপদী কবিতা ; অমিত্রাক্ষর ছন্দ ; গৈরিশ ছন্দ ; ত্রিপদী ; চৌপদী বা চতুষ্পদী ; ললিত, দিগক্ষরা ; একাবলী, মিশ্র ছন্দ, নূতন ছন্দ, অক্ষরবৃত্তে দীর্ঘ পয়ার, বর্ণবৃত্তে লঘু ত্রিপদী, স্বরবৃত্তে চতুষ্পদী, অসমছন্দ ; গযল কবিতা ; রুবাই কবিতা ; সংস্কৃত ছন্দ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক ; তোটক, মালিনী ; রুচিরা, মন্দাক্রান্তা,

শার্দূলবিক্রীড়িত; পঞ্চচামর, ছন্দের ভাষা। **অলঙ্কার-প্রকরণ:** শব্দালঙ্কার, যমক; শ্লেষ, অর্থালঙ্কার, উপমা; মালোপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা; ভ্রান্তিমান্, অপহ্নুতি; নিশ্চয়; অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, দৃষ্টান্ত; নির্দেশনা, বিভাবনা, বিশেষোক্তি; অর্থান্তরন্যাস; সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি; ব্যাজস্তুতি, অনন্বয়, সন্দেহ; প্রতিবস্তুপমা, দীপক, সমুচ্চয়; পর্যায় পরিসংখ্যা, বিরোধ, বিরোধাভাস; অসঙ্গতি, তুল্যযোগিতা, কাব্যলিঙ্গ; প্রতীপ, বিষম, অপ্রস্তুত-প্রশংসা। **পরিশিষ্ট:** ধ্বনি-পরিবর্তন বিধি; সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, প্রতিশব্দ; বিপরীতার্থক শব্দ; অশুদ্ধি সংশোধন; বাঙ্গালা ও ইংরেজী ব্যাকরণের প্রভেদ; বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও পারসীর অনুলিখন; ঈকার-যুক্ত শব্দ; উকার-যুক্ত শব্দ; ব-ফলাযুক্ত কয়েকটি শব্দ; স্বাভাবিক ণ-কারযুক্ত শব্দ; কতকগুলি ষ-কারযুক্ত শব্দ; চন্দ্রবিন্দুযুক্ত শব্দ, ড-কারযুক্ত শব্দ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র।

১৫০ পৃঃ ২৩ ছত্রের পর। বাংলা সাহিত্যের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড: মধ্যযুগ। প্রথম প্রকাশ-ফাল্গুন ১৩৭১। পরিবর্ধিত সং—কার্তিক ১৩৭৪। পৃঃ [১২]+৬১০+৩৮ [৬]

'বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। এই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে আমার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে হইয়াছে। আমি আমার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি। আমার পুর্বসূরিগণের নিকট আমি পদে পদে ঋণী। আমি তাঁহাদের সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবি। আমি ইঁহাদের অভিমতের কোনও কোনও স্থানে আমার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছি। সুখের বিষয় কতিপয় সুধী তাহা সমর্থন করিয়াছেন।' (মুখবন্ধ: ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৭১)

'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথার ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ প্রকাশের অল্পকাল মধ্যে এই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হওয়ায় পাঠকসমাজে ইহার সমাদর সূচিত হইয়াছে। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।… পুস্তকে একটি নির্ঘণ্ট সংযোজন এবং লৌকিক পীরগণের কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।' (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা: ২৮. ৭. ১৩৭৪)

১৫২ পৃঃ ১৭ ছত্রের পর। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত

'১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের সাহিত্য-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। কিন্তু তখন আমি করাচীতে উর্দু উন্নয়ন-বোর্ডের সম্পাদক রূপে ব্যাপৃত থাকায় তাহার সংশোধনে কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ফলে তাহাতে অনেক মারাত্মক মুদ্রণ-রাক্ষস রহিয়া যায়। বর্তমানে বাংলা একাডেমী তাহার প্রকাশনভার লওয়ায় তাহা এবার প্রথম সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হইল।...“নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্” ন্যায় অনুসারে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার যে মতানৈক্য আছে, তাহা আমি ইহাতে প্রকাশ করিয়াছি।...ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক ব্যতীত বিশেষরূপে আমি আমার প্রাক্তন অধ্যাপক ফুল ব্লক এবং আর. পিশেল-এর পুস্তকদ্বয় হইতে সাহায্য পাইয়াছি।' (ভূমিকা : ১৪ই আশ্বিন ১৩৭২ সাল, ৩০. ৯. ১৯৬৫ ইং)

১৫৭ পৃঃ ১৩ ছত্রের পর। রুবা'ইয়্যাত-ই-উমর-খয়্যাম। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫২। পৃঃ [১০+৬০]+৩৮ [৬]

“রুবা'ঈ (বহুবচনে রুবা'ইয়্যাত) চতুষ্পদী কবিতা। ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে একই মিল থাকে। কখন চারি চরণে একই মিল দেখা যায়।... গযল বসরাই গোলাপ আর রুবা'ঈ গোলাপের নির্যাস। এক ফোঁটা, কিন্তু গন্ধে ভরপুর। আমি আমার অনুবাদে রুবা'ঈর এই কাঠামো বজায় রাখিয়াছি।

“জার্মাণ-পারসীবিদ Friedrisoh Rosen ৭২১ হিজরীতে (১৩২১ খৃঃ) লিখিত একখানি হস্তলিপির সাহায্যে উমর খয়্যামের রুবা'ইয়্যাতের একটি সংস্করণ মূল্যবান পারসী ভূমিকা ও ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশিত করিয়াছেন।...ইহার রুবা'ইয়্যাত সংখ্যা ৩২৯। সম্পাদক এই সংস্করণের সহিত আরও দুইখানি খয়্যামের রুবা'ইয়্যাত সংগ্রহ অনুবাদসহ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। একটি মুহম্মদ বিন্ বদর-ই জার্জসী কর্তৃক সংগৃহীত।.. ইহাতে ১৩টি রুবা'ইয়্যাত আছে। দ্বিতীয়টি সুলতান মুহম্মদ নূর কর্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে ৬৩টি রুবা'ইয়্যাত আছে। আমার সংগ্রহে মূল গ্রন্থের ১২৬টি রুবা'ইয়্যাত আছে। পরিচয়ের জন্য বন্ধনী মধ্যে মূলের ইংরেজী সংখ্যার পূর্বে R. লেখা হইয়াছে। জার্জসী হইতে ২টি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার বন্ধনীমধ্যে ইংরেজি সংখ্যার পূর্বে J. লেখা হইয়াছে।

“অক্সফোর্ডের বোড্লিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত ১৮৬৫ হিঃ, ১৪৬০ খৃঃ লিখিত একটি প্রাচীন হস্তলিপিতে খয়্যামের ১৫৮টি রুবা'ইয়্যাত সংগৃহীত হইয়াছে।...আমি ইহা হইতে ২২টি রুবা'ইয়্যাত গ্রহণ করিয়াছি। এইগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে B. চিহ্নিত করিয়া মূলের ইংরেজি সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

“লখ্নৌয়ের বিখ্যাত নওল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে উমর খয়্যামের ৭৭০টি রুবা'ইয়্যাত আছে।...আমি ইহা হইতে একটি রুবা'ঈ লইয়াছি।...

আমার সঞ্চয়নে মোট ১৫১টি রুবা'ইয়্যাত আছে।…আমার সংগ্রহের রুবা'ঈ যে খাঁটি তাহা জোর করিয়া বলিতে পারিব না। তবে ইহার অধিকাংশ যে আসল, তাহা অবাধে বলিতে পারি।" (মুখবন্ধ। ৫. ১০. ৪২ ইং)

"দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সমাজে গুণগ্রাহিতার অভাব কিংবা আমার অযোগ্যতা, ইহার বিচারভার ভবিষ্যতের পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিলাম।…পরিশিষ্টে একটি কুঞ্চিকা যোগ করিয়াছি।" (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা। ১৭. ১০. ৫২ ইং)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বংশ-লতিকা

